POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ
يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِيْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ
بَعْدِهٖ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ○

যদি আল্লাহ্ তোমাদিগতকে সাহায্য করেন,তাহা হইলে কেহই তোমাদের উপর জয়যুক্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু তিনি যদি তোমাদিগকে বিপদে নিঃসঙ্গরূপে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্যতীত কে আছে যে তোমাদিগকে সাহায্য করিবে? এবং আল্লাহ্‌র উপরই মোমেনগণকে নির্ভর করা উচিত।

(আলে ইমরান:১৬১)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 3

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 16 জানুয়ারী, 2020 20 জামাদিউল আওয়াল 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

কুরআন করীম দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে সেই নিরক্ষর ব্যক্তি আমাদেরকে কেবল কিতাব এবং প্রজ্ঞাই শেখান নি, বরং আত্ম-শুদ্ধির পথ সম্পর্কে অবগত করেছেন, এমনকি أَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ -এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

রসুল করীম (সা.)-এর অনন্য মর্যাদা

যেহেতু আমাদের নবী করীম (সা.) সমগ্রবিশ্বের মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এসেছিলেন, সেই কারণে এই বৈশিষ্টটি তাঁর মধ্যে পরম উৎকর্ষে পৌঁছেছিল। কুরআন মজীদ তাঁর এই মর্যাদাটি সম্পর্কেই একাধিক স্থানে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। আর আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর সাপেক্ষে একই ভঙ্গিতে আঁ হযরত (সা.)-এর গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। مَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (আম্বিয়া: ১০৮) অনুরূপভাবে قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (আল আরাফ: ১৫৯)। কুরআন করীমের অন্যান্য স্থানগুলির উপর গভীর দৃষ্টি দিলে জানা যায় যে আঁ হযরত (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা 'উম্মি' বা অক্ষর-পরিচহীন বলে বর্ণনা করেছেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লা ভিন্ন তাঁর দ্বিতীয় কোন শিক্ষক ছিল না। আঁ হযরত (সা.) নিজে নিরক্ষর হলেও তাঁর ধর্মে অশিক্ষিত, সাধারণ মেধার মানুষ থেকে উচ্চমানের দার্শনিক ও পণ্ডিতবর্গ প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছে। যার মাধ্যমে قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا -এর অর্থ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে বোঝা সম্ভব। 'জামিয়া'-র দুটি অর্থ। প্রথমত সমগ্র মানবজাতি বা সৃষ্টিজগত। দ্বিতীয়ত সমস্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য। অর্থাৎ সাধারণ মেধার মানুষ হোক বা অশিক্ষিত শ্রেণী হোক কিম্বা উচ্চ মেধাসম্পন্ন দার্শনিক হোক- সমস্ত স্তরের মানুষের জন্য। মোটকথা সমস্ত প্রকারের মেধা ও প্রকৃতির মানুষ আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

কুরআন করীম দেখে আশ্চর্য হতে হয় যে সেই নিরক্ষর ব্যক্তি আমাদেরকে কেবল কিতাব এবং প্রজ্ঞাই শেখান নি, বরং আত্ম-শুদ্ধির পথ সম্পর্কেও অবগত করেছেন, এমনকি أَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ (মুজাদিলা-২৩)-এর স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। গভীর দৃষ্টিতে দেখ যে কুরআন শরীফ সমস্ত প্রকৃতির অন্বেষণকারীকে তার গন্তব্যে পৌঁছে দেয় আর সত্য ও সাধুতার জন্য প্রত্যেক তৃষ্ণার্তকে পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ! প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের এই স্রোত, সত্য ও জ্যোতির প্রস্রবণ কার উপর অবতীর্ণ হল? এই মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপর যাঁকে এক দিকে নিরক্ষর বলা হচ্ছে, আর অপরদিকে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে সেই তত্ত্বজ্ঞানের পরম ঔৎকর্ষ ও সত্যের বাণী যার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এটি আল্লাহ্ তা'লার পরম কৃপা, যাতে মানুষ উপলব্ধি করে যে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে মানুষের কতদূর পর্যন্ত সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে? আমার একথা বলার উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। নৈকট্যপ্রাপ্তদের সঙ্গে খোদার এমনই নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে যে সৃষ্টি পূজারী মানুষ তাদেরকেই খোদা মনে করে বসে। একথা যথার্থ যে (ফার্সি)

খোদার পুরুষরা নিজেরা খোদা নয়,

তথাপি তারা খোদা থেকেও বিচ্ছিন্ন নয়।'

তাদের সঙ্গে খোদার সম্পর্ক এমনই উপভোগ্য হয়ে থাকে যে তারা দোয়া না করলেও আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন। সংক্ষেপে এই যে, মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদা হল সেই 'নফসে মুতমাইন্না' বা শান্তি-প্রাপ্ত আত্মা, যে কথা আমি আলোচনার প্রারম্ভেই বর্ণনা করেছি। এই অবস্থাতেই, বা বলা যায় তাদের প্রত্যেক অবস্থাতে, এমন উচ্চমর্যাদার মানুষ খোদার সঙ্গে এতটাই নিবিড় সম্পর্কে বাঁধা পড়ে যে তাদের সেই সম্পর্ক সাধারণ বন্ধনকে অতিক্রম করে অনন্য সাধারণ সম্পর্কে পরিণত হয় যা জাগতিক অগভীর কোন সম্পর্ক নয়, এই সম্পর্ক হল সর্বোচ্চ ও স্বর্গীয় প্রকারের। অর্থাৎ এই প্রশান্তি যাকে সফলতা এবং অবিচলতাও বলা হয়ে থাকে আর اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (ফাতেহা: ৬) আয়াতেও এই দিকে ইঙ্গিত রয়েছে আর এই পথের দোয়া শেখানো হয়েছে। আর অবিচলতার পথ তাদের যারা আল্লাহ্‌র পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে। আল্লাহ তা'লার পুরস্কারপ্রাপ্তদের পথ সম্পর্কে সবিশেষ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে অবিচলতার পথগুলি ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু অবিচলতা যা সফলতার পথের নাম, সেটি হল আম্বিয়া আলাইহিমুসসালামের পথ। এই আয়াতে আরও ইঙ্গিত রয়েছে যে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর মাধ্যমে মানুষের জিহ্বা, অন্তর এবং কর্মের মাধ্যমে দোয়া হয়ে থাকে। আর মানুষ যখন খোদার কাছে সৎকর্মশীল হওয়ার দোয়া চায় তখন সে লজ্জা অনুভব করে। কিন্তু এই দোয়াই সেই সব সমস্যাবলীকে দূরীভূত করে। اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (ফাতেহা: ৫) তোমারই ইবাদত করি আর তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ -এর উপর اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এজন্য প্রাধান্য পায় যে মানুষ দোয়ার সময় সমস্ত শক্তি-বৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে খোদার দিকে আসে। শক্তিমূহকে কাজে না লাগানো আর প্রকৃতির নিয়ম মেনে না চলাও আর এক প্রকার বেয়াদপি। যেমন একজন কৃষক যদি জমিতে বীজ বপনের পূর্বেই এই দোয়া করে যে হে আল্লাহ্! এই জমিকে শস্য-শ্যামল করে দাও। তবে তার এই দোয়া এক্ষেত্রে ঠাট্টা-বিদ্রুপ হিসেবে পরিগণিত হবে। যে বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটিকেই খোদার পরীক্ষা বলা হয়ে থাকে। আর এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে খোদাকে পরীক্ষা করো না। যেরূপ মসীহ আলাইহিস সালামের খাদ্য-সম্ভার যাচনার ঘটনায় এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে প্রণিধান কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃ: ১০৪-১০৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী হযরত ইয়াযিদ বিন সাবিত, হযরত মুয়ায়ে বিন আমর বিন জামুহ এবং হযরত বিশর বিন বারাআ রাযিআল্লাহু আনহুম-এর পবিত্র জীবনালেখ্য

রসুল করীম (সা.)-এর আদর্শ: মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা

পঙ্গুত্ব থাকা সত্ত্বেও হযরত আমার বিন জামুহ যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রবল ইচ্ছা রাখতেন। তিনি যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন।

একজন ইহুদী মহিলার পক্ষ থেকে রসুল করীম (সা.)-এর বিষমিশ্রিত মাংস খাওয়ানো এবং এরপরেও তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাপনের বর্ণনা

মাননীয় নাসির আহমদ সাহেব ইবনে মুকাররম আলি মহম্মদ সাহেব রাজেনপুরা এবং আতাউল করীম মুবাশ্বের সাহেব ইবনে মুকাররম মিয়াঁ আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব শেখুপুরা-এর মৃত্যু। মৃতদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক , ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ২৯ নভেম্বর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২৯ নবুয়্যত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু মালেক বিন নাজ্জার বংশীয় ছিলেন। হযরত ইয়াযিদের পিতার নাম ছিল সাবেত বিন যাহ্হাক এবং মাতার নাম ছিল নওয়া বিনতে মালেক। হযরত ইয়াযিদ হযরত যায়েদ বিন সাবেত-এর বড় ভাই ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩৭)

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৭৭)

হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত দুবাইয়া বিনতে সাবেতকে বিয়ে করেছিলেন।

(আততাবাকাতু কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫৪)

তার সম্পর্কে এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত বদর ও উহুদ- উভয় যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইয়ামামা-র যুদ্ধের দিন ১২ হিজরী সনে তিনি শাহাদত বরণ করেন। অপর এক ভাষ্য মতে, ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি তির বিদ্ধ হন, ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে পরলোক গমন করেন।

(আলইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩২) (কিতাবুস সুকাত লি ইবনে হুব্বান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৬৮)

হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত বর্ণনা করেন যে, তারা মহানবী (সা.)-এর সাথে বসে ছিলেন, এমন সময় এক জনের মরদেহ অতিক্রান্ত হতে দেখা যায়। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) দাঁড়িয়ে যান আর যারা তাঁর (সা.) সাথে ছিলেন তারাও দাঁড়িয়ে যান। যতক্ষণ সেই মরদেহ নিয়ে যাওয়া না হয়, ততক্ষণ তাঁরা সবাই দাঁড়িয়ে থাকেন।

(সুনান নিসাঈ, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৯২০)

এই একই ঘটনা অপর এক রেওয়ায়েতে বিশদভাবে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত (রা.) কর্তৃক বর্ণিত যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর পাশে অন্যান্য সাহাবীরা বসে ছিলেন। তখনই এক জনের মরদেহ নিয়ে যেতে দেখা যায়। মহানবী (সা.) সেই মরদেহ দেখামাত্রই দাঁড়িয়ে যান আর তাঁর সাহাবীরাও দ্রুত দাঁড়িয়ে পড়েন। সেই মরদেহ নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন। হযরত ইয়াযিদ বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার মনে হয় না তিনি (সা.) কোন কষ্ট বা জায়গার স্বল্পতার কারণে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার মনে হয়, সেটি কোন ইহুদি নারী বা পুরুষের মরদেহ ছিল। আমরা তাঁকে (সা.) তাঁর দাঁড়ানোর হেতুও জিজ্ঞেস করি নি।

(আল মুসান্নিফ লি ইবনে আবি শেবা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৭৩২)

হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যে, তারা একদিন মহানবী (সা.)-এর সাথে বের হন। এটি সুনানে নিসাঈ-এর বর্ণনা। আর পূর্বেরটি ইতিহাসের কোন গ্রন্থের। হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত (রা.) বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে বের হই। (এটি দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে,) তিনি (সা.) একটি নতুন কবর দেখেন এবং বলেন, এটি কী? লোকজন উত্তর দেয়, এটি অমুক গোত্রের এক ক্রীতদাসীর কবর। এতে মহানবী (সা.) তাকে চিনতে পারেন। সাহাবীরা নিবেদন করেন, এই ক্রীতদাসী দুপুরের সময় মারা গিয়েছিল যখন আপনি বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আপনি যেহেতু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তাই আমরা আপনাকে ডাকা পছন্দ করি নি। এটি শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) দাঁড়িয়ে যান এবং নিজের পেছনে সারিবদ্ধভাবে মানুষকে দাঁড় করিয়ে তাতে অর্থাৎ সেই কবরে চারবার তাকবীর বলেন। তিনি (সা.) সারি তৈরি করে জানাযা পড়েন। এরপর তিনি বলেন, আমি যতক্ষণ তোমাদের মাঝে আছি তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই মৃত্যু বরণ করবে তার সংবাদ আমাকে অবশ্যই অবগত করবে, কেননা আমার দোয়া তার জন্য রহমত স্বরূপ।

(সুনান নিসাঈ, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-২০২২)

একইভাবে এই বর্ণনা মুসলিম এবং সুনানে আবু দাঊদ আর ইবনে মাজাহ্-তেও রয়েছে। ইবনে মাজাহ্-তে এভাবে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ হযরত ইয়াযিদ বিন সাবেত(রা.), যিনি যায়েদের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, বর্ণনা করেন যে, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে বের হই। তিনি (সা.) যখন জান্নাতুল বাকী-তে পৌঁছেন, সেখানে একটি নতুন কবর দেখতে পান। তিনি উক্ত কবর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। সাহাবীরা নিবেদন করেন যে, এটি অমুক মহিলার কবর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (সা.) সেই মহিলাকে চিনতে পারেন এবং বলেন, তোমরা আমাকে তার সম্পর্কে কেন অবগত কর নি। সাহাবীরা নিবেদন করেন, আপনি দুপুরে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আর আপনি রোযাও রেখেছিলেন, তাই আমরা আপনাকে কষ্ট দিতে চাই নি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার অজান্তে তোমরা কোন কাজ করবে না। অর্থাৎ আমি কখনো এমনটি বলি নি। তোমাদের মধ্য থেকে যে-ই মৃত্যু বরণ করুক, যতদিন পর্যন্ত আমি তোমাদের মাঝে আছি, আমাকে অবশ্যই তার বিষয়ে অবগত করবে কেননা আমার দোয়া তার জন্য রহমতের কারণ হবে। অতঃপর মহানবী (সা.) সেই মহিলার কবরের পাশে যান আর আমরা তাঁর (সা.) পেছনে সারিবদ্ধ হই এবং তিনি (সা.) তাতে চার তাকবীর বলেন।

(সুনান নিসাঈ, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১৫২৮)

সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর পক্ষ থেকে কৃষ্ণাঙ্গ এক মহিলার কবরে জানাযা পড়ার বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, উক্ত মহিলা মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিতেন। সেই মহিলা মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী (সা.) যখন তাকে কয়েকদিন দেখতে পান নি তখন তিনি (সা.) উক্ত মহিলার বিষয়ে জানতে চাইলে মানুষ জানায় যে, সে মৃত্যু বরণ করেছে। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে কি তোমাদের তার বিষয়ে আমাকে পূর্বে অবগত করা উচিত ছিল না? সেই মহিলার কবর কোথায় বলো। অতএব তিনি (সা.) সেই মহিলার কবরে যান এবং তার জানাযা পড়েন।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪৫৮) (সহী বুখারী কিতাবুস সালাত, হাদীস-৪৬০)

সুনান ইবনে মাজাহ্-র ব্যাখ্যা-পুস্তক ইনজাযুল হাজা-র রচয়িতা লিখেন যে, তিনি একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ছিলেন যার নাম ইমাম বায়হাকী 'উম্মে মেহজান' বলে উল্লেখ করেছেন আর ইবনে মানদাহ্ তার নাম 'খারকাহ্' বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে মহিলা সাহাবীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর এটিও হতে পারে যে, সেই মহিলার প্রকৃত নাম 'খারকাহ্' এবং 'উম্মে মেহজান' তার ডাকনাম বা উপনাম। অর্থাৎ দু'টি নামই সঠিক।

(সুনান ইবনে মাজাহ্-র ব্যাখ্যা-পুস্তক ইনজাযুল হাজা, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৩৩২)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত মুআব্বেয বিন আমর বিন জমুহ্। হযরত মুআব্বেয আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু জুশাম বংশের সদস্য ছিলেন।

(আসসীরাতুন্নবুয়াত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৭০)

হযরত মুআব্বেয-এর পিতার নাম আমর বিন জমুহ্ এবং তার মায়ের নাম হিন্দ বিনতে আমর ছিল। হযরত মুআব্বেয বিন আমর বিন জমুহ্ নিজের দুই ভ্রাতা হযরত মুআয এবং খাল্লাদ-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া তিনি উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৪২৭)

হযরত মুআব্বেয বিন আমরএর পিতা হলেন সেই আমর বিন জমুহ্ যাকে তার ছেলেরা তার পঙ্গুত্বের কারণে বা পায়ে সমস্যা থাকার কারণে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দেয় নি। এ বিষয়ে পূর্বেও এক খুতবায় আমি উল্লেখ করেছিলাম। এখন সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিচ্ছি যে, উহুদের যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আমর বিন জমুহ্ নিজ পুত্রদের বলেন, বদরের যুদ্ধের সময় তোমারা আমাকে যুদ্ধে যেতে দাও নি কিন্তু এখন উহুদের যুদ্ধে আমি অবশ্যই যাব, তোমরা আমাকে বাধা দিতে পারবে না। তার পুত্ররা বারংবার বলে, আপনার পা অচল, এমতাবস্থায় আপনার জন্য যুদ্ধ করা ফরয নয় বা আবশ্যক নয়। কিন্তু হযরত আমর বিন জমুহ্ তা দের কথা শুনেন নি এবং মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন আর নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার সন্তানেরা আমার অচল পায়ের কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে আমাকে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আমি আপনাদের সাথে যুদ্ধে যেতে চাই। মহানবী (সা.)ও একই কথা বলেন যে, তোমার যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে, তোমাকে আল্লাহ্তা'লা শারীরিকভাবে অক্ষম আখ্যা দিয়েছেন,তাই তোমার জন্য জিহাদ করা ফরয বা আবশ্যক নয়। কিন্তু যাহোক, অবশেষে মহানবী (সা.) তার স্পৃহা বা আগ্রহ দেখে তাকে অনুমতি প্রদান করেন। হযরত আমর বিন জমুহ্ নি জের যুদ্ধ সরঞ্জাম নেন আর এ কথা বলে (যুদ্ধে) চলে যান যে, হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি শাহাদাতের মর্যাদা দান কর আর তুমি আমাকে ব্যর্থ মনোরোথ করে আমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরিয়ে এনোনা। পরবর্তীতে বাস্তবেই তার এ আকঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় আর তিনি উহুদের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শহীদ হন। তার শাহাদাতের পর তার স্ত্রী হযরত হিন্দ তাকে এবং নিজ ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন আমর-কে একটি বাহনে উঠিয়ে নেন আর তাদের দুজনকে একই কবরে দাফন করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, সেই সত্তার কসম যার হতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি আমরকে জান্নাতে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে দেখেছি।

(উসদুল গাবা,৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯৫-১৯৬)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত বিশর বিন বারা বিন মা'রুর। হযরত বিশর আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু উবায়েদ বিন আদী বংশের সদস্য ছিলেন। অপর এক ভাষ্য অনুসারে তিনি বনু সালামা-র সদস্য ছিলেন।

(আসসীরাতুন্নবুয়াত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৭১)
(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা লি ইবনে আসীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮০)

দুটি ভিন্ন ভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে।

হযরত বিশর-এর পিতার নাম হযরত বারা বিন মা'রুর আর মাতার নাম খুলায়দা বিনতে কায়েস ছিল।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৯১)

হযরত বিশর-এর পিতা হযরত বারা বিন মা'রুর সেই বারো জন নেতার একজন ছিলেন যাদেরকে সর্দার নিযুক্ত করা হয়েছিল আর তিনি বনু সালামা গোত্রের নেতা ছিলেন। হযরত বারা হিজরতের এক মাস পূর্বে সফররত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন। মহানবী (সা.) হিজরত করে মদিনায় আসার পর তার কবরের কাছে গিয়ে চারবার তাকবীর বলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা লি ইবনে আসীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৫-৩৬৬)

হযরত বিশর তার পিতার সাথে আকাবার দ্বিতীয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। হযরত বিশর বিন বারা মহানবী (সা.)-এর সুদক্ষ তিরন্দাজ সাহাবীদের একজন ছিলেন। মহনবী (সা.) হযরত বিশর এবং মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতকারী হযরত ওয়াকেদ বিন আব্দুল্লাহ্র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। হযরত বিশর বদর, উহুদ, খন্দক বা পরিখা, হুদায়বিয়া এবং খায়বারের যুদ্ধাভিযানে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৯১)
(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২৬)

আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, হে বনু নাযালা! (কোন কোন রেওয়ায়েতে বনু সালামা লেখা হয়েছে) তোমাদের নেতা কে? তারা উত্তর দেয়, জাদ্ বিন কায়েস। তখন তিনি (সা.) বলেন, তোমরা তাকে কী কারণে নেতা মান্য কর? তারা নিবেদন করে, তিনি আমাদের চেয়ে বেশি সম্পদশালী, অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ও বড় মানুষ, তাই আমরা তাকে নেতা বানিয়েছি, কিন্তু একই সাথে তারা এও বলে যে, কেবল তার কার্পণ্যের কারণে আমরা তাকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করি। সে খুবই কৃপণ ও কিপটে মানুষ। তার এ বিষয়টিই আমাদের পছন্দ নয়। মহানবী (সা.) বলেন, কৃপণতার চেয়ে বড় ব্যাধি আর কোনটি আছে? কৃপণ হওয়া তো অনেক বড় ব্যাধি, তাই সে তোমাদের নেতা নয়। আর এ কারণে সে তোমাদের নেতা হতে পারে না। তারা নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তাহলে আপনিই বলে দিন আমাদের নেতা কে? তখন মহানবী (সা.) বলেন, বিশর বিন বারা বিন মা'রুর তোমাদের নেতা। অর্থাৎ যে সাহাবির স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার সম্পর্কে বলেন যে, তিনি তোমাদের নেতা। অপর এক রেওয়ায়েতে এই শব্দ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের নেতা হলেন, গৌর বর্ণের এবং কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট বিশর বিন বারা বিন মা'রুর।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৯১)
(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২৬-৪২৭)

হযরত বিশর বিন বারা হযরত কুবায়সা বিনতে সাইফীকে

বিয়ে করেন, যার গর্ভে তার এক কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে যার নাম ছিল আলিয়া। হযরত কুবায়সা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে বয়আতও করেছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড,পৃ: ৪৩৫)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদিরা মহানবী (সা.)-এর দোহাই দিয়ে দিয়ে অওস ও খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে বিজয়ের জন্য দোয়া করত। পরস্পর যুদ্ধ করার সময় এ দোয়া করত যে, যে নবীর আবির্ভা বের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তাঁর নামেআমাদেরকে বিজয় দান কর- আল্লাহ্ তা'লার কাছে তারা এই প্রার্থনা করত।কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যখন মহানবী (সা.) কে আরব ভূমিতে প্রেরণ করেনতখন তারাই তাঁকে অস্বীকার করে এবং তারা যা বলতো তার অস্বীকারকারী হয়ে যায়। অস্বীকারকারীরা সর্বদা এমনটিই করে থাকে। হযরত মুয়ায বিন জাবাল ও হযরত বিশর বিন বারা এবং হযরত দাঊদ বিন সালামা (রা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে একদিন বলেন, হে ইহুদি দল! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। পূর্বে তোমরাই তো মুহাম্মদ নামক নবীর আগমনের মাধ্যমে আমাদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করতে এবং এটি বলতে যে, এমন একজন নবীর আগমন হবে যার নাম হবে মুহাম্মদ। আর তাঁর মাধ্যমে তোমরা বিজয় লাভের দোয়া করতে, যখনকিনা আমরা মুশরিক ছিলাম। হযরত বিশর বিন বারা (রা.) বলেন, আমরা তো মুশরিক ছিলাম আর তোমরা আমাদেরকে এই কথা বলতে যে, সেই নবী আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন। এখন সময় হয়ে গেছে, তিনি অচিরেই আবির্ভূত হবেন। একই সাথে তোমরা আমাদেরকে তাঁর লক্ষণ বর্ণনা করে বলতে যে, তাঁর এই এই লক্ষণ হবে। এখন যখন তিনি আগমন করেছেন তখন তোমরা কেন সেই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করছ না? সালাম বিন মিশকাম নামক এক ইহুদি, যে কিনা বনূ নাযীর গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে বনূ নযীর গোত্রের নেতা এবং তাদের ধনভাণ্ডারের তত্ত্বাবধায়কও ছিল। এই ব্যক্তি যয়নব বিনতে হারেস নাম্নী সেই মহিলার স্বামী ছিল যে কিনা খায়বারের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-কে বিষ মিশ্রিত মাংস খেতে দিয়েছিল। যাহোক এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, এই নবী আমাদের কাছে তা নিয়ে আসে নি যা আমরা চিনি এবং তিনি সেই নবী নন যার কথা আমরা তোমাদেরকে বলেছিলাম। সমস্ত লক্ষণ পূর্ণ হয়ে গিয়েছে তবুও তারা বলে যে, না,তিনি আমাদের কাছে তা নিয়ে আসেন নি যা আমরা চিনি। অতএব

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। **(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

সমস্ত লক্ষণ যেহেতু পূর্ণ হয় নি তাই আমরা তাঁকে মানব না। তখন আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتٰبٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ۙ وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ

অর্থাৎ আর যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের কাছে এমন এক গ্রন্থ অবতীর্ণ হয় যা সেই শিক্ষার সত্যায়ন করছিল যা তাদের কাছে ছিল, আর ইতিপূর্বে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধেআল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করত; অতঃপর যখন তা তাদের কাছে চলে আসে যা তারা চিনতে পারে, তবুও তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। সুতরাং কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আল বাকারা, আয়াত-৯০)

(আসসীরাতুন্নবুয়াত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৮১)

(আসসীরাতুন্নবুয়াত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫১২)

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম বর্ণনা করেন যে, যখন উহুদের যুদ্ধের চিত্র পাল্টে যায়, তখন আমি মহানবী(সা.)-এর কাছাকাছি ছিলাম, যখন কি-না আমরা সবাই বিভ্রান্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম এবং আমাদের উপর তন্দ্রা অবতীর্ণ করা হয়; অর্থাৎ এমন অবস্থা ছিল যে মনে হচ্ছিল যেন আমরা সবাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। অতএব আমাদের মধ্যে কেউ এমন ছিল না, যার থুঁতনি তার বুকের উপর ছিল না; অর্থাৎ ঘুম ও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় মাথা নিচে ঝুঁকে পড়েছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমার এমন মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্নে মুআত্তেব বিন কুশায়ের-এর শব্দ শোনা যাচ্ছে; সে বলছিল, যদি আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকতো, তাহলে আমরা কখনো এখানে এভাবে নিহত হতাম না। হযরত মুআত্তেব বিন কুশায়ের আনসারী সাহাবী ছিলেন এবং আকাবার বয়আত, বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি তার উক্ত বাক্য মুখস্ত করে নিই, যেটি আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। এই ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ

অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দুঃখের পর প্রশান্তি দানের উদ্দেশ্যে তোমাদের জন্য নিদ্রা অবতীর্ণ করেন যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করছিল, যখন কিনা আরেকটি দল এমন ছিল যাদেরকে তাদের প্রাণ চিন্তিত করে রেখেছিল। তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে অজ্ঞদের ন্যায় ভুল ধারণা করছিল। তারা বলছিল, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহে আমাদেরও কোন অধিকার আছে কি? তুমি বলে দাও, সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তা'লারই হাতে। (আলে ইমরান, আয়াত:১৫৫)

হযরত কা'ব বিন আমর আনসারী বর্ণনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধের দিন এক সময় আমি আমার জাতির ১৪ জন লোকের সাথে মহানবী (সা.) এর পাশে ছিলাম। তখন আমরা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম, যা অত্যন্ত শান্তিদায়ক ছিল। অর্থাৎ অত্যন্ত প্রশান্তিদায়ক নিদ্রা ছিল। যুদ্ধের অবস্থা ছিল, কিন্তু তা এমন নিদ্রা ছিল যা আমাদেরকে প্রশান্তি দান করছিল। এমন কোন ব্যক্তি ছিল না যার বুক থেকে হাপরের ন্যায় নাক ডাকার শব্দ আসছিল না। কখনো কখনো এমন গভীর অবস্থাও সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি বলেন, আমি দেখি যে, বিশর বিন বারা বিন মা'রুর, অর্থাৎ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে, তাঁর হাত থেকে তরবারি পড়ে যায় এবং তরবারি পড়ে যাওয়ার অনুভব পর্যন্ত তাঁর হয় নি, অথচ মুশরেকরা আমাদের উপর আক্রমণ করছিল।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩১০) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৩২)

যাহোক তিনি অনুভব করে থাকবেন যে, তরবারি পড়ে গেছে, কেননা তখন এমন পরিস্থিতিতে নিদ্রা যদিও ছিল, কিন্তু হাতে তাদের হাতিয়ার শক্ত করে ধরা থাকতো অথবা পড়ে যেতে চাইলে ঝটকা লাগতো। যাহোক এর ব্যাখ্যা অর্থাৎ, 'নুআশ' শব্দটি যা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, এর ব্যাখ্যা হযরত খলিফাতুল মসীহ আল রাবে তাঁর এক দরসে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

'আমানাতুন নুআশা' -বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর যে অর্থ রয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই দাঁড়াবে যে, দুঃখের পর তোমাদের উপর এমন শান্তি অবতীর্ণ করেছেন যাকে নিদ্রা বলা যেতে পারে অথবা এমন তন্দ্রা প্রদান ক রেছেন যা শান্তিদায়ক ছিল অথবা এমন শান্তি দিয়েছেন যা ঘুমের ন্যায় প্রভাব রাখে অথবা ঘুমেরই অন্তর্ভূক্ত।

অথবা এমন তন্দ্রা দান করেন যা শান্তিদায়ক ছিল। অথবা সেই শান্তি দিয়েছেন যা ঘুমের মতো প্রভাব রাখে অথবা ঘুমের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

'আমানাতান নুআসান' এর এটি অর্থ। তন্দ্রা সাময়িকভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝাকি লাগাকেও বলে। কিন্তু এখানে 'নুআস' এর অর্থ এ ধরণের তন্দ্রা নয় বরং সেই অবস্থা যা সজাগ থাকা ও ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যবর্তী অবস্থা হয়ে থাকে। ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে একটি মধ্যবর্তী অবস্থা এমন আসে যখন সমস্ত স্নায়ু একটি প্রশান্তি লাভ করে আর সেটাই গভীর প্রশান্তি। যদি এই প্রশান্তি একইভাবে অব্যাহত থাকে তাহলে ঘুমে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমন অবস্থায় মানুষ যদি চলতে থাকে তাহলে পড়বে না, পড়ে যাওয়ার পূর্বে তার ঝটকা লাগে আর সে জেনে যায় যে, সে কোন অবস্থায় ছিল। কিন্তু যদি ঘুম এসে যায় তাহলে নিজের স্নায়ুর উপর, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর কোন ইখতিয়ার থাকে না। যাহোক হতে পারে বিশর বিন বারা'র এমন গভীর ঘুম এসে গিয়েছিল। কিন্তু সেটি ছিল যুদ্ধাবস্থা সত্ত্বেও প্রশান্তির অবস্থা। আর মানুষ যদি পড়ে যায় এবং এ কারণেই তার হাত সামান্য ঢিলা হলে তলোয়ার পড়ে যায়; যদি এটিকে সঠিক বলেও গ্রহণ করা হয়। যাহোক কিন্তু এটি এমন অবস্থা হয়ে থাকে যখন তৎক্ষণাত অনুভবও হয়ে যায় যে আমি গভীর ঘুমে তলিয়ে যাচ্ছি। এতে করে মানুষ ঝটকা লেগে জেগে যায়। আল্লাহতা'লা বলেন আমরা তোমাদের ওপর এমন একটি প্রশান্তির অবস্থা দান করেছিলাম যা ঘুমের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল, কিন্তু ঘুমের মতো এত গভীর ছিল না যে তোমাদের নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর কোন ইখতিয়ার না থাকে। সেটা প্রশান্তি তো দিচ্ছিল কিন্তু ে তামাদেরকে অকেজো করছিল না।

হযরত আবু তালহা (রা.) বর্ণনা করেন এবং এটি বুখারীর হাদীস যে, উহুদের দিন যুদ্ধাবস্থায় আমাদেরকে তন্দ্রা কাবু করে ফেললো, আর এটি সেই তন্দ্রা যার উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে। হযরত তালহা বলেন, তলোয়ার আমার হাত থেকে পড়ার উপক্রম হতো আর আমি সামলে নিতাম। সুতরাং এই হাদীসটিও বলছে যে, এমন ঘুমের অবস্থা ছিল না যে হাত থেকে জিনিস নীচে পড়ে যাবে অথবা চলতে চলতে আমরা পড়ে যাবো। প্রশান্তি ছিল কিন্তু একটি সীমা পর্যন্ত আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ ছিল। এরপর পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতেন, কোনমতে নিজেকে শামলে নিতেন। অর্থাৎ এটি হঠাৎ আসা তন্দ্রাচ্ছন্নতা ছিল না, বরং এরুপ একটি অবস্থা ছিল যা ঐসব লোকদের উপর কিছুক্ষন বিরাজ করছিল।

তিরমিযীর তফসীর অধ্যায়ে হযরত আবু তালহা (রা.) কর্তৃক বর্নিত, উহুদের যুদ্ধের দিন আমি মাথা উঁচু করে দেখতে থাকি, প্রত্যেকেই রাত জাগার কারনে বা ক্লান্তির কারণে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে ঢালের নীচে ঝুমছিল। এসব সাহাবীদের খুব খারাপ অবস্থা ছিল। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি প্রশান্তি তারা লাভ করতে থাকে। তিনি বলেন, সবার মধ্যে এরুপ দৃশ্য ছিল যা কোন মুজাহিদের উপর হঠাৎ ছেয়ে যাওয়া কোন অবস্থা ছিল না। বরং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহ.) লিখেছেন, সব মুজাহিদ যারা হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাথে যুদ্ধে শত্রুদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ ফলাসদৃশ ছিলেন তাদের উপর হঠাৎ যেন আকাশ থেকে একটি জিনিষ নেমে আসে এবং ঐ অবস্থা তাদের উপর ছেয়ে যায়। তখন তাদের এ প্রশান্তির খুব দরকার ছিল। তাদের শিরা উপশিরা সতেজ করার, সেগুলোকে সতেজ করার খুবই প্রয়োজন ছিল। তাদের ঘুমানোর কোন সময় ছিল না। যখন এরুপ ক্লান্তিকর অবস্থায় মানুষের মধ্যে এমন অবস্থাই সৃষ্টি হয়। যাহোক, পুরো দল একই সময়ে এরুপ এক অবস্থায় চলে যায় যখন লড়াই চলছে এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে ভীষন ভয়েরও কারন থাকে, তখন এটি এক মহা পুরস্কার ও নিদর্শন স্বরুপ। এটি কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় যা কোন কোন লোকের সাথে ঘটে যায়। এটি ঘটনাচক্রে ঘটে যাওয়া কোন বিষয় নয় বরং একটি অলৌকিক নিদর্শন ছিল। এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি একটি বিশেষ প্রশান্তিময় অবস্থা তখন তাদেরকে দান করা হয়েছিল।

(হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-প্রদত্ত দরসুল কুরআন-এর চয়নকৃত অংশ, প্রদত্ত ৬ই রমযান, ১৭ ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪)

হযরত বিশর খয়বরের যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ্ (স.) এর সাথে সেই বিষাক্ত ছাগলের মাংস খেয়েছিলেন যা এক ইহুদী নারী উপহার স্বরুপ মহানবী (স.) কে দান করেছিলেন। হযরত বিশার (রা.) যখন নিজের গ্রাস গ্রহণ করেন আর খাবারের স্থান তখনও তিনি ত্যাগ করেন নি আর সেখানেই তার চেহারার রঙ পরিবর্তন হতে থাকে আর তা 'তায়লসান' কাপড়ের মত হয়ে যায়। এটি এক ধরনের কাপড়, যার মাঝে কালো রঙের পরিমাণ অধিক দেখা যায়। এক বছর পর্যন্ত তিনি এত কষ্ট ভোগ করেন যে, কারো সাহায্য ছাড়া পার্শ্ব পরিবর্তন

যুগ খলীফার বাণী

" খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি করা এবং এই সম্পর্ককে সুদৃঢ় করাই আমাদের পরম কর্তব্য।।" (খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪৫শে মার্চ, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali, Amir Birbhum District

পর্যন্ত করতে পারতেন না আর এ অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি নিজ স্থান ত্যাগও করতে পারেন নি আর বিষ এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, খাবার গ্রহণের পরক্ষণই তার মৃত্যু ঘটে।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯১)

হযরত বিশার বিন বারআ (রা.) যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন তার মা অনেক কষ্ট পান। তিনি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! বিশারের মৃত্যু বনু সালামাকে ধ্বংস করে দিবে। মৃতরা কি একে অপরকে চিনতে পারবে? সে যে কাজ করেছে এর ফলে সে তো ধ্বংস হবেই। প্রশ্ন হল- মৃতরা কি একে অপরকে চিনতে পারবে? বিশারের কাছে কি সালাম পৌঁছানো সম্ভব। এতে মহানবী (সা.) বলেন-হ্যাঁ, হে উম্মে বিশার! সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, যেভাবে বৃক্ষে বসা অবস্থায় পাখিরা একে অপরকে চিনতে পারে ঠিক সেভাবেই জান্নাতিরাও একে অপরকে চিনতে পারবে।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রুশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩২)

এই কথার অর্থ হল, যিনি মৃত্যুপথ যাত্রী তার হাতে সালাম পৌঁছাতে পারব কি না। একটি রেওয়ায়েতে এই শব্দ রয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর উক্ত কথা শোনার পর বনু সালামার গোত্রের কোন সদস্য যখন মৃত্যুপথযাত্রী হতেন তখন হযরত বিশারের মা তার কাছে যেতেন আর বলতেন- হে উমুক, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তখন এর উত্তরে তিনিও বলতেন তোমার প্রতিও শান্তি। এরপর তিনি বলতেন, বিশারকে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ-এর ব্যাখ্যা-পুস্তক 'মিরকাতুল মাফাতিহ', ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৯৯, কিতাবুল জানায়েয)

বনু সালামার গোত্রের কোন ব্যক্তি মৃতপথযাত্রী হলেই তিনি তার কাছে গিয়ে বলতেন- বিশরের কাছে আমার সালাম পৌঁছাবে। তিনি বনু সালামা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। [হুযূর (আই.) বলেন,] প্রথমে হয়তো আমি শত্রুর কথা উল্লেখ করেছিলাম, এটি শত্রু সংক্রান্ত কথা নয় বরং এটি তাদের কথা বলার একটি ধরণ ছিল যে- বিশারের মৃত্যুতে বনু সালামা গোত্রকে ধ্বংস করে দিবে। মৃতরা কি একে অপরকে চিনতে পারবে, কেননা বিশরের মৃত্যু আমাদের জন্য অনেক কষ্টের কারণ। বিশরের কাছে কি সালাম পৌঁছানো যাবে?অর্থাৎ এটি আমাদের জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক। বিশ্‌রকে সালাম পৌঁছানো যেতে পারে কি না। মহানবী (সা.) বললেন, অবশ্যই। এরপর প্রত্যেক মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিকে এই বার্তা দিতেন যে, তুমি যখন জান্নাতে যাবে বিশ্‌রকে আমদের সালাম পৌঁছাবে।

একটি বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুশয্যায় যখন হযরত বিশিরের বোন (সাক্ষাত করতে) এলেন তখন হুযুর (সা.) তাকে বললেন, খয়বরের প্রান্তরে আমি তোমার ভাইয়ের সাথে যে এক লোকমা অর্থাৎ এক গ্রাস খাবার খেয়েছিলাম সে কারণেই আমি আমার স্নায়ুতে বা শিরা উপশিরায় যন্ত্রণা অনুভব করি।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৮২)

এই ঘটনা বর্ণনা গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিস্তারিতভাবে এর তফসীর করেছেন। তিনি (রা.) লিখেছেন যে,

ইহুদী মহিলা সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলো, মহানবী (সা.) পশুর শরীরের কোন অংশের মাংস বেশি পছন্দ করেন। জবাবে সাহাবী বললেন, তিনি (সা.) দাস্তির মাংস অর্থাৎ সামনের দুই পায়ের রানের মাংস বেশি পছন্দ করেন। একথা শুনে সেই মহিলা একটি ছাগল জবাই করলো; পাথরের উপরে এর কাবাব বানালো তারপর সেই মাংসে বিশেষ করে সামনের দুই পায়ের মাংসে বিষ মিশালো যে সম্বন্ধে তাকে বলা হয়েছিল যে, রসূল করীম (সা.) সামনের দুই পায়ের মাংস বেশি পছন্দ করেন। অত:পর সূর্যাস্তের পরে রসূল করীম (সা.) যখন মাগরিবের নামায পড়ে নিজ ডেরায় ফেরত আসছিলেন তখন তিনি (সা.) তাঁবুর পাশে এক মহিলা বসে থাকতে দেখলেন। তিনি (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি, এখানেকী মনে করে? সে বললো, হে আবুল কাসেম! আমি আপনার জন্য একটি উপহার নিয়ে এসেছি। মহানবী (সা.) জনৈক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন, এই মহিলা যা দিচ্ছে তা নিয়ে নাও। তারপর হুযুর (সা.) যখন খেতে বসলেন তখন সেই ভুনা মাংসও তাঁর (সা.)-এর সামনে পরিবেশন করা হয়। হুযুর (সা.) সেখান থেকে এক গ্রাস (লোকমা) খেলেন এবং তাঁর (সা.) একজন সাহাবী বশীর বিন বারাআ বিন মা'রূরও এক গ্রাস খেলেন। যাহোক, ইতিহাসের পুস্তকাবলীতে হযরত বিশর বিন বারা'আর নাম কতিপয় স্থানে বাশির বিন বারা'আও লিপিবদ্ধ আছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এখানে বাশির বিন বারা'আ লিখেছেন, যিনি মূলত বিশার বিন বারা'আই ছিলেন। ইতোমধ্যে অন্যান্য সাহাবাগণও মাংস খেতে হাত বাড়ালেন, তখন মহানবী (সা.) বললেন, খেও না। কেননা এই হাত আমাকে জানিয়েছে যে, মাংসে বিষ মেশানো আছে। অর্থাৎ, এর অর্থ এটি নয় যে, তাঁর প্রতি ইলহাম হয়েছিল, বরং এটি আরবের একটি বাগধারা। এর অর্থ হল, এই মাংস চেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে, এতে বিষ মেশানো আছে। সুতরাং এখানে এটি অর্থ নয়। বাগধারা অনুযায়ী এটি বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, তাঁর হাত জানিয়েছিল। বরং এর অর্থ ছিল, এর মাংস চাখার কারণে আমি বুঝতে পেরেছি। পরবর্তী বাক্য এসকল অর্থ স্পষ্ট করে দিচ্ছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, এরপর বাশির বলেন, এর বিষদ বর্ণনায়, কুরআন করীমেও হযরত মূসা (আ.) এর যুগের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে একটি দেয়ালের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। যার অর্থ কেবল এতটুকু যে, এতে পড়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এখানেও একই অর্থ। এটি বাগধারা হিসেবে বলা হয়েছে। এরপর তিনি বলেন, তখন বাশির বলেন, অর্থাৎ, বিশার বিন বারা'আ, যে খোদা আপনাকে সম্মানিত করেছেন তার কসম খেয়ে আমি বলছি, আমারও এই লোকমায় বিষ অনুভুত হয়েছে। আমার অন্তর চেয়েছিল যে, আমি সেটাকে উগলিয়ে দেই, কিন্তু আমি ভাবলাম, যদি আমি এমনটি করি তাহলে আপনার অসুবিধা হবে না তো এবং আপনার খাওয়া নষ্ট হবে না তো! আমার স্বস্তি ছিল না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল, কিছু আছে। আর যখন আপনি সেই লোকমা মুখে পুরে নিলেন, তখন আমিও আপনার অনুসরণে মুখে পুরে নিলাম। যেন আমার হৃদয় এটি বলছিল যে, যেহেতু আমার সন্দেহ আছে যে, এতে বিষ আছে, তাই যদি মুহাম্মদ (সা.) এটি না খেতেন! এর কিছুক্ষণ পর বাশিরের শরীর খারাপ হয়ে গেল এবং অনেক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি খায়বারেই মৃত্যবরণ করেন। আর কতিপয় বর্ণনায় রয়েছে, এরপর কিছু সময় অসুস্থ ছিলেন, এরপর মৃত্যুবরণ করেন। রসূল করীম সাল্লাল্লাহুআলাইহে ওয়া সাল্লাম সেই ছাগলের অল্প কিছু মাংস একটি কুকুর সামনে নিক্ষেপ করেন যা খেয়ে সেই কুকুর মারা যায়। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেই মহিলাকে ডাকেন। এবং বলেন, তুমি এই ছাগলে বিষ মিশ্রিত করেছ। সে বলে, আপনাকে একথা কে বলেছে? তাঁর (সা.) হাতে তখন ছাগলের হাত ছিল। তিনি (সা.) বলেন, এই হাত আমাকে বলেছে। তখন সেই মহিলা বুঝতে পারে তাঁর (সা.) কাছে এই গোপন রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেছে। তখন সে স্বিকার করে যে, সে বিষ মিশিয়েছে। তারপর তিনি (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ঘৃণ্য কাজ করতে তোমাকে কিসে প্ররোচিত করেছে? সে উত্তর দেয়, আমার জাতির সাথে আপনার যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে আমার আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়েছে। আমার অন্তরে এই ভাবনার উদয় হয় যে, আমি তাঁকে (সা.) বিষ প্রয়োগ করব। যদি উনার কর্মকাণ্ড মনুষ্য কর্মকাণ্ড হয় তবে আমরা তাঁর (সা.) থেকে মুক্তি লাভ করব আর যদি তিনি (সা.) সত্য নবী হয়ে থাকেন তবে স্বয়ং খোদা তালা তাঁকে রক্ষা করবেন। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তার এই কথা শুনে তাকে ক্ষমা করে দেন আর তার প্রাপ্য শাস্তি যা মৃত্যুদণ্ড ছিল তা থেকে মুক্তি দেন। এই ঘটনা এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নিজ এবং নিজ সাথীদের হত্যাকারীগনকে কিরূপে ক্ষমা করে দিতেন। বস্তুত তিনি (সা.) তখনই শাস্তি দিতেন যখন কোন ব্যক্তির জীবিত থাকা ভবিষ্যতে বহু ফিতনা-ফ্যাসাদের কারণ হতে পারে।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল খণ্ড-২০, পৃ: ৩২৭-৩২৯)

যাইহোক একটি প্রচলিত ধারণা আছে, কিছু শত্রু এটি আপত্তি করে থাকে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মৃত্যু এই বিষের প্রভাবেই হয়েছিল। ইতিহাস ও জীবনচরিতের কিছু বইও এই বিতর্ক

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam, Jalpaiguri District

উসকে দিয়েছে। কিছু জীবনীকার রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে শাহাদাতের মর্যাদা দানের জন্য সেসকল বর্ণনা গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যায় যেখানে এর উল্লেখ আছে যে, এই বিষের প্রভাবেই তিনি (সা.) মৃত্যু বরণ করেছেন। অথচ বাস্তবিকতার নিরিখে এই কথা সঠিক নয়। আমাদের রিসার্চ সেলও এ সম্পর্কে আমাকে একটি নোট প্রেরণ করেছে যা আমি আপনাদের শুনিয়ে দিচ্ছি। সে মোতাবেক তারা বলেন, ইতিহাস এবং সীরাত বা হাদীসের যে কোন গ্রন্থ থেকে কই এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, মহানবী (সা.) এর মৃত্যু বিষ প্রয়োগের ফলে হয় নি। যে এমন কথা বলে সে এ সংক্রান্ত রেওয়াত বা হাদীসের জ্ঞান রাখে না বা সে এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত। স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে, বিষ প্রয়োগের ঘটনা খায়বার যুদ্ধের সময় ঘটেছিল যা ষষ্ঠ বা সপ্তম হিজরির শেষে অথবা সপ্তম হিজরির প্রথম দিকে ঘটেছিল। আর সেই ঘটনার প্রায় চার বৎসর পর পর্যন্ত তিনি (সা.) জীবিত ছিলেন। সেই ঘটনার পূর্বে যেভাবে তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছিলেন ঠিক সেভাবেই এই ঘটনার পর তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়। সব ধরনের ইবাদত এবং অন্যান্য ব্যপারেও তিনি (সা.) এক ইঞ্চিও কমতি প্রদর্শন করেন নি। প্রায় চার বৎসর পর তাঁর জ্বর হওয়া এবং মাথা ব্যাথা হওয়া এবং এর পর তাঁর মৃত্যু হওয়াতে কোন বুদ্ধিমান এ কথা বলতে পারে না যে, চার বৎসর পর বিষ প্রয়োগের কারনে তা হয়েছে। আসলে বুখারি এবং অন্যান্য কতিপয় হাদীসর গ্রন্থে একটি হাদীস রয়েছে যার অনুবাদ সঠিকভাব না বুঝার কারণে এই অর্থ করা হয় যে, তাঁর মৃত্যু বিষ প্রয়োগের ফলে হয়েছিল। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। বুখারীর সেই হাদীসের অনুবাদ আমি বলে দিচ্ছি, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) মৃত্যুর যন্ত্রনায় এ কথা বলতেন যে, হে আয়েশা! আমি খায়বারে যে খাবার খেয়েছিলাম তার কষ্ট আমি সর্বদা অনুভব করছি আর এখনো আমার মনে হচ্ছে, সেই বিষের কারণে আমার সমস্ত রগ কেটে যাচ্ছে।

(সহী বুখারী,কিতাবুল মাগাযী, হাদীস - ৪৪২৮)

এই হাদীস দ্বারাই কিছু মুসলমান এবং অমুসলমান মুফাসসের এবং হাদীস বিশারদ এটিই মনে করেন যে, হয়তো বা সেই কষ্টের কারনেই মহানবী (সা.) এর মৃত্যু হয়েছিল। আর এই হাদীসের ব্যাখ্যাও তারা করেন যে, এ কারনে মহানবী (সা.) কে শহীদ বলা যেতে পারে বা শহীদ আখ্যা দেন। আবার অনেকের মতে এই হাদীস এ কথার সমর্থন করে না।এতে কেবল একটি কষ্টের প্রকাশ রয়েছে যা মহানবী (সা.) সেই সময় করেছিলেন। আর সবাই জানে যে, অনেক সময় কোন দৈহিক কষ্ট বা আঘাত বা ব্যাধি কখনো কখনো বিশেষ উপলক্ষ্যে কোন কারণে প্রকট আকার ধারণ করে। খায়বারের সময় যে বিষ এবং মাংস তিনি (সা.) খেয়েছিলেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত রেওয়ায়েত সমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে এটিও পাওয়া যায় যে, বিষ মিশ্রিত মাংস তিনি (সা.) মুখে দিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু গলাধঃকরণ করেন বা খান নি। আর যদি খেয়েও থাকেন তাহলে তার স্বাভাবিক জীবন এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে, এটি অবশ্যই তাঁর মৃত্যুর কারণ ছিল না। তবে হ্যাঁ এই বিষের কারণে পাকস্থলির যে ক্ষতি হয়েছিল, অর্থাৎ পাকস্থলি বা অন্ত্রের যে ক্ষতি হয়েছিল কোন ব্যাধিতে তা বৃদ্ধি পায়। আর এটি প্রাকৃতিক বিষয়, কখনো কখনো এমনটি হয়ে থাকে। আর মুখে নেয়ার কারণে তাঁর কণ্ঠনালী এবং আল-জিহ্বায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং কখনো কখনো খাওয়ার সময় তিনি (সা.)সেখানে কষ্ট অনুভব করতেন। হাদীসে এই ঘটনাটি পূর্ণ বিবরণসহ উল্লিখিত আছে আর সেখানে এটিও লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এতে বিষ রয়েছে, তাই তিনি (সা.) সাহাবীদের তা খেতে বাধা দিয়েছিলেন। আর বিষ মিশ্রণকারী নারীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে যে, আমরা এজন্য বিষ মিশিয়েছি যে, আপনি যদি খোদার পক্ষ থেকে সত্য রসূল হয়ে থাকেন তাহলে আপনি রক্ষা পাবেন, নতুবা আমরা আপনার কাছ থেকে রক্ষা পাব। যেহেতু ইহুদিরা তাঁর রক্ষা পাওয়ার ঘোষণা দিচ্ছে আর তাঁকে (সা.) দেখার পর সেই মহিলার কথা ছিল যে, এত মারাত্মক বিষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি রক্ষা পেয়ে গেছেন, অতএব তিনি (সা.) রক্ষা পেয়েছেন। বরং কতিপয় রেওয়ায়েতে এই মহিলার ইসলাম গ্রহণেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। যা-ই হোক, সেই ইহুদি এই বিষে মারা না যাওয়ার স্বীকারোক্তি দিচ্ছে এবং এটিকে নিদর্শন আখ্যা দিচ্ছে। তাই এ কথা বলা যে, এই বিষের কারণে তাঁর (সা.) মৃত্যু হয়েছে, এটি মোটেই সঠিক নয়।

বাকি স্মৃতিচারণ ইনশাআল্লাহ্ পরবরর্তীতে হবে।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

এখন আমি দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব যাদের গায়েবানা জানাযা ইনশাআল্লাহ্আমি নামাযের পর পড়াব। প্রথম জানাযা হলো মোকাররম নাসীর আহমদ সাহেবের যিনি রাজনপুরের মোকাররম আলী মুহাম্মদ সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ২১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ৬৩ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মরহুমের বংশে তার বড় দাদা মোহাম্মদ দ্বীন সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সূচনা হয়েছিল। তিনি যীরা তহশিলের ফিরোজপুর জেলার একটি গ্রাম মালসিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি তার ভাই মোকাররম এলাহী বখ্শ সাহেবের সাথে ১৯০৭ সনে পত্রের মাধ্যমে বয়আত করেছিলেন এবং এরপর ১৯০৮ সনে কাদিয়ানের সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন। মরহুম নাসীর সাহেব রাজনপুরে জেলা নায়েব আমীর ছাড়াও আনসারুল্লাহ্র নায়েব যয়ীম ও জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবেও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি পাঁচ ওয়াক্ত বাজামা'ত নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন এবং রীতিমত নামায পড়তেন। তাদের যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ছিল, আর ঘরের সকল ভাই, ভাতিজা, ভাতিজীদের নামাযের সময় বার বার স্মরণ করাতেন। ফজরের সময় পুরো বাড়িতেঘুরতেন, অনেক বড় বাড়ি ছিল যাতে তারা একত্রে বাস করতেন এবং তাতে বিভিন্ন ঘর ছিল। সবাইকে ফজরের নামাযের জন্য জাগাতেন। নিজেও পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর অন্যদেরও এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনদেরও অর্থাৎ ছোট বয়সের যারা-ই ছিল, তাদের সবাইকেজিজ্ঞেস করতেন। আর (এ ক্ষেত্রে) অলসতা থাকলে নিয়মিত তিলাওয়াত করার নসীহত করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদির অধ্যয়ন নিজেও করতেন এবং নিজের সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন অর্থাৎ ভাই ভাতিজা যারা ছিল তাদেরকেও এর নসীহত করতেন। একইভাবে নিয়মিত খুতবা শুনতেন। এম.টি.এ.-তে নিয়মিত নিজে শুনতেন এবং এটিও নিশ্চিত করতেন যে, সবাই অর্থাৎ পরিবারের সব সদস্যরা যারা একই বাড়িতে বাস করেন, তারা খুতবা শুনেছেন কিনা। চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও তবলীগের কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। পরিবারের সদস্যরা যদি সাবধানতা অবলম্বন করতে বলতো যে, পরিস্থিতি এরূপ! সাবধান থাকুন– তখন তিনি উত্তরে বলতেন, খোদারপ্রেরিত ব্যক্তির বাণী মানুষের কাছে না পৌঁছালে আল্লাহ্ তা'লাকে আমি কীভাবে মুখ দেখাব। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া এক কন্যা আর তিন পুত্র রয়েছে। তার এক ছেলে খালেদ আহমদ সাহেব জামা'তের মুরব্বী, যিনি বর্তমানে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালীতে সেবার তৌফিক পাচ্ছেন আর সেখানে কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে জানাযায় যোগ দিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, (তার সাথে) ক্ষমাসূলভ ব্যবহার করুন। আর তার পরবর্তীপ্রজন্মকেও এবং সন্তান-সন্ততিকেও তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, মিয়া আল্লাহ্ দিত্তা সাহেবের পুত্র শ্রদ্ধেয় আতাউল করীম মুবাশ্বের সাহেবের। তিনি শেখুপুরা জেলার কিরতু নিবাসী আর বর্তমানে কানাডায় বসবাস করতেন। গত ১৩ই নভেম্বর তারিখে ৭৫ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। মরহুমের পরিবারে তার পিতা শ্রদ্ধেয় আল্লাহ্ দিত্তা সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছিল, যিনি ১৯৩৪ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র হাতে বয়আত করেছিলেন। আর আহমদী হওয়ার পর সারা জীবন ওয়াক্ফ (অর্থাৎ জীবন উৎসর্গকারীর) মতো যাপন করেছেন। সর্বদা তবলীগ করেছেন। বহু পরিবারকে আহমদী বানিয়েছেন আর সারাজীবন ওয়াক্ফ এর চেতনা নিয়ে জামা'তের সেবা করেছেন। এছাড়া যতদিন পাকিস্তানের লাহোরে ছিলেন আরো অনেকভাবে জামা'তের সেবা করতে থেকেছেন। এরপর ২০০৭ সনে তিনি কানাডায় স্থানান্তরিত হন। সেখানে নিজ জামাতে সেক্রেটারী ইশায়াত হিসেবে সেবার তৌফিক পেয়েছেন। ফুসফুসের ব্যাধির কারণে স্থায়ীভাবে তার অক্সিজেন লাগানো ছিল। স্বাস্থ্য যতদিন অনুমতি দিয়েছে ততদিন নিজের হুইল চেয়ারে করে নিয়মিত নামায পড়ার জন্য যেতেন। একান্ত বীরত্বের সাথে রোগের মোকাবিলা করেছেন, কখনো কোন অনুযোগ করেন নি। জামা'তের ব্যবস্থাপনা এবং খিলাফতের প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল, ঐকান্তিক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। অত্যন্ত মেধাবী ও সঠিক/উত্তম পরামর্শদাতা ছিলেন।

খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

স্বচ্ছমনা ও সরলপ্রাণ মানুষ ছিলেন। তার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই একথা বলেছে যে, আমার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। প্রতেকের প্রতি একনিষ্ঠ ও কল্যাণকামী সত্তা ছিলেন। কখনো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ-অনুযোগ করেন নি। সবার সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া দুই কন্যা আর দু'জন পুত্র রয়েছেন। তার এক ছেলে আতাউল মান্নান তাহের সাহেব জামা'তের মুরব্বী, যিনি বর্তমানে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দপ্তরে নায়েব নাযের হিসেবে সেবা প্রদানের তৌফিক পাচ্ছেন আর একজন পৌত্র জাযেব আহমদ জামেয়া আহমদীয়া কানাডার শিক্ষার্থী। তিনি জামা'তের কবি আব্দুল করীম কুদসী সাহেবের বড় ভাই ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন, পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানসন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মকে তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

****

ভিন জাতিতে বিবাহ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"আমাদের জাতিতে এও একটি কুপ্রথা প্রচলিত রয়েছে যার কারণে তারা ভিন জাতিতে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া পছন্দ করে না। শুধু তাই নয়, যতদূর সম্ভব হয় ভিন জাতির মেয়ে বিবাহ করাও পছন্দ করে না। এটি প্রকাশ্য ঔদ্ধত্য ও অহংকারপূর্ণ আচরণ যা ইসলামের শরীয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সকল আদম সন্তান আল্লাহ্‌র বান্দা। বিবাহ-সম্পর্ক তৈরী করার সময় যেটি দেখার বিষয় তা হল যার সঙ্গে নিকাহ করা হচ্ছে সে পুণ্যবান/পুণ্যবতী কি না আর সে এমন কোন পরীক্ষায় নিপতিত নয় তো যা বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে? আর স্মরণ রাখা উচিত, ইসলামে জাতিভেদের কোনও স্থান নেই, কেবল তাকওয়া এবং পুণ্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- 'ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আত্‌কাকুম'। অর্থাৎ তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি খোদা তা'লার নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানীয় যে অধিক মুত্তাকি।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪৮-৪৯)

(নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

ড্রাইভার হিসেবে খিদমতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান-এ ড্রাইভারের পদ শূন্য রয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি ড্রাইভার হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক তারা নিজেদের আবেদনপত্র দুই মাসের মধ্যে নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় প্রেরণ করুন। শর্তাবলী নিম্নরূপ।

১) প্রত্যাশীর কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকতে হবে।২) জন্ম-শংসাপত্র থাকা আবশ্যক। ৩) প্রত্যাশীকে নিযুক্তি বোর্ডের ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ হতে হবে। ৪) কাদিয়ানের নুর হাসপাতাল থেকে মেডিক্যাল ফিটনেস সার্টিফিকেট অনুসারে সুস্থ ও সবল হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। ৫) দ্বিতীয় শ্রেণীর সমান ভর্তুকি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। ৬) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজেকে বহন করতে হবে। ৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকে করতে হবে।

নোট: আবেদন ফর্ম নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া থেকে সংগ্রহ করুন।

(নাযির দিওয়ান, কাদিয়ান)

বিস্তারিত জানার জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

নাযারত দিওয়ান কাদিয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান

(Ph) 01872-501130 (Mob) 9877138347, 9646351280

E-mail: diwan@qadian.in

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

দ্বিতীয় খুতবার শেষাংশ

করা ছাড়া কোন সামর্থ্য রাখে না, তাদেরকে যারা হাসিঠাট্টা করে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের তিরস্কারের উত্তর দিবেন এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব নির্ধারিত আছে।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২১৫) (লুগাতুল হাদীস, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৮৭)

অর্থাৎ যারা মানুষের ওপর অপবাদ আরোপ করে এবং মুনাফেকদের জন্য। যাহোক হযরত হেলাল বিন উমাইয়্যার প্রেক্ষাপটে এই কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত হেলাল বিন উমাইয়্যার স্মৃতিচারণ সংক্রান্ত আরো কিছু কথা আছে যা ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি ওয়াকফে নও বিভাগের পক্ষ থেকে একটি ঘোষণা করছি। তারা ধিয়ভবহড়ঁরহঃষ.ড়ৎম নামে ওয়াকফে নও সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইট বানিয়েছে। আজ এটির উদ্বোধন হবে। এই ওয়েবসাইটে পিতামাতারা তাদের হবু সন্তানকে ওয়াকফে নও স্কীমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে লেখা পত্র এবং এর উত্তর সম্পর্কে সরাসরি বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে দিক নির্দেশনা নিতে পারে। এছাড়া পিতামাতা ও ওয়াকফীনে নওদের শিক্ষা-দীক্ষা তালিম তরবিয়্যত সংক্রান্ত আমার যে দিক নির্দেশনা বা পথ নির্দেশনা রয়েছে সে সম্পর্কে পথ নির্দেশনাও পেতে পারে। এই ওয়েবসাইটে খলীফাদের খুতবা এবং বক্তৃতা, ওয়াকফে নও এর সিলেবাস, তাদের পত্রিকা বা ম্যাগাজিন- ছেলেদের জন্য 'ইসমাঈল' আর মেয়েদের জন্য 'মরিয়ম' পত্রিকাও দেখতে পারে এবং পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলোও পড়তে পারে। এছাড়া ওয়াকফীনে নও এর ক্যারিয়ার প্ল্যানিং বা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা লাভ করতে পারে। ওয়েবসাইটে ওয়াকফ নবায়ন, ওয়াকফে নও বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখা এবং তথ্য হালনাগাদ করারও সুযোগ রয়েছে। ওয়াকফে নওরা জামা'তের প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন তথ্যও লাভ করতে পারে অর্থাৎ কী ধরনের পড়ালেখা তাদের করা উচিত যেন জামা'তের উত্তমভাবে সেবা করা যায়। এছাড়া সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এবং ব্যবস্থাপকদের দিক-নির্দেশনার জন্য তথ্য এবং রিপোর্ট ফর্মও এতে থাকবে। ওয়াকফীনে নও এর কিছু প্রশ্ন, যা বিভিন্ন সময় আমার ক্লাস ইত্যাদিতে তারা করেছে সেগুলোর ভিডিও ক্লিপসও এতে রয়েছে। এছাড়া ওয়াকফে নও এর পরিচিতি, ওয়াকফে নও বিভাগের সাথে স্থায়ী যোগাযোগ বজায় রাখা সংক্রান্ত তথ্যাবলীও রয়েছে। বিভিন্ন দেশে ওয়াকফে নও এর বরাতে বিভিন্ন প্রোগ্রামের রিপোর্টএবং কিছু ছবিও এতে থাকবে। আজ এটির উদ্বোধন হবে। ওয়াকফে নও এবং তাদের পিতামাতাদের এটি থেকে অবশ্যই কল্যাণ লাভ করা উচিত। (আমীন) ।

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

(সম্পাদকীয়)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

জুমআর খুতবা

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী রসুল করীম (সা.) হযরত হিলাল বিন উমাইয়া ওয়াকেফি-এর পবিত্র জীবনালেখ্য

তাবুকের যুদ্ধের সময় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা সাহাবীর থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘটনা এবং তাঁর ক্ষমালাভের বিস্তারিত ঘটনা।

ওয়াকফে নও মারকাযিয়া (ইউকে) -এর ওয়েবসাইট-এর সূচনার ঘোষণা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মড র্ন থেকে প্রদত্ত ৬ ডিসেম্বরর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (৬ ফাতাহ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ আমি যে বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করবো তার নাম হলো, হযরত হেলাল (রা.)। তার পুরো নাম হলো, হযরত হেলাল বিন উমাইয়া ওয়াকেফী। তিনি আনসারদের অওস গোত্রের বনু ওয়াকেফ বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তার পিতার নাম উমাইয়া বিন আমের এবং মাতার নাম উনায়সা বিনতে হিদাম ছিল, যিনি ছিলেন কুলসুম বিন হিদামের বোন। কুলসুম বিন হিদাম সেই মহিলা সাহাবী মদিনায় হিজরতের সময় কুবায় যার ঘরে রসূলুল্লাহ্ (সা.) অবস্থান করেছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৩৮০-৩৮১)

হযরত হেলাল বিন উমাইয়া (রা.) সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি দুই বিয়ে করেছিলেন। একটি হলো, ফুরায়েহ্ বিনতে মালেক বিন দুখশিমের সাথে এবং অপরটি মুলায়েকা বিনতে আব্দুল্লাহ্র সাথে। হযরত হেলাল (রা.)-এর উভয় স্ত্রী ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৮২)

হযরত হেলাল বিন উমাইয়া ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তিনি বনু ওয়াকেফ গোত্রের প্রতিমা ভেঙেছিলেন। এছাড়া মক্কা বিজয়ের দিন তার গোত্রের পতাকা তারই হাতে ছিল।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড,পৃ:৩৮১)

হযরত হেলাল বিন উমাইয়া বদর ও উহুদসহ পরবর্তীতে সংঘটিত যুদ্ধগুলোতে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগদান করার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। তবে তাবুকের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। ইবনে হিশাম তার গ্রন্থে বদরী সাহাবীদের যে তালিকা উল্লেখ করেছেন, তাতে হযরত হেলাল (রা.)-এর নাম নেই, তবে সহীহ বুখারীতে তাকে বদরী সাহাবী হিসাবে গণ্য করা করা হয়েছে।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪২৮) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা,৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৮১)(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি)

হযরত হেলাল বিন উমাইয়া সেই তিন আনসারী সাহাবীর অন্যতম ছিলেন যারা কোনরূপ অপারগতা না থাকা সত্ত্বেও তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। অপর দু'জন সাহাবী ছিলেন, কা'ব বিন মালেক এবং মুরারা বিন রাবী'। তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এই আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছিল,

وَّعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

(সূরা তওবা: ১১৮)

অর্থাৎ আর আল্লাহ্ সেই তিনজনের তওবা গ্রহণ করে সদয় দৃষ্টিপাত করলেন যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল এমনকি ভূপৃষ্ঠ এর বিশালতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের জন্য তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল। তারা বুঝে গিয়েছিল, আল্লাহ্র শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে তাঁর আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নাই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করলেন যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ই বারবার তওবাগ্রহণকারী, পরম দয়াময়।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড,পৃ:৩৮৫)

নবম হিজরী সনে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সহীহ বুখারীতে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণসহ রেওয়ায়েত রয়েছে যেখানে এই তিনজন সাহাবীর পশ্চাদে রয়ে যাওয়ার ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.)-এর নাতি আব্দুর রহমান তার পিতা আব্দুল্লাহ্ বিন কা'ব (রা.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত কা'ব যখন অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তখন তিনি তাকে ধরে ধরে নিয়ে যেতেন। তিনি বলেন, আমি হযরত কা'ব বিন মালেককে সেই ঘটনা বলতে শুনেছি। এটি একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েত এবং এটি হযরত কা'ব বিন মালেক সম্পর্কে। যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে অর্থাৎ হযরত হেলাল বিন উমাইয়া, উক্ত বর্ণনার মাঝে তারও উল্লেখ হয়। তবে এটিও একটি রেওয়ায়েত।

যাহোক, তিনি বলেন, হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.)-কে সেই ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন যেখন তিনি পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলেন অর্থাৎ তাবুকের ঘটনা। হযরত কা'ব বলেন, মহানবী (সা.) স্বয়ং যেসব যুদ্ধাভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন এমন কোন যুদ্ধাভিযানে আমি পশ্চাতে থাকি নি, কেবল তাবুকের যুদ্ধাভিযান ছাড়া। হ্যাঁ, বদরের যুদ্ধেও আমি পশ্চাতে ছিলাম (বা অংশগ্রহণ করতে পারি নি) কিন্তু যারা বদরের যুদ্ধে পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল মহানবী (সা.) তাদের কারো প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। মহানবী (সা.) কেবল কুরাইশ কাফেলাকে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন, কিন্তু ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল, যুদ্ধ করার কোনরূপ অভিপ্রায় না থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে শত্রুর মোকাবিলা করিয়ে দেন। এছাড়া আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে আকাবার রাতেও উপস্থিত ছিলাম। অর্থাৎ তিনি বদরের ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমি বদরেও অংশগ্রহণ করি নি, কিন্তু বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে মহানবী (সা.) কোন প্রকার অসন্তুষ্টি দেখান নি। মোটকথা তিনি বলেন, আমরা যখন আকাবা-য় ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা করি আর আমি চাইতাম না যে, সেই রাতের প্রতিদানে আমার বদরে শরিক হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হোক, যদিও বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা আকাবায় বয়আতকারীদের তুলনায় অধিক বিখ্যাত। আর আমার অবস্থা এরূপ ছিল ছিল যে, আমি কখনোই এতটা সম্পদশালী এবং স্বাচ্ছন্দে ছিলাম না যতটা তখন ছিলাম যখন কিনা আমি তাঁর (সা.) সাথে ঐ যুদ্ধাভিযানে যাবার পরিবর্তে পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলাম অর্থাৎ তাবুকে। তিনি বলেন যে, আল্লাহ্র কসম, ইতিপূর্বে কখনোই আমার কাছে বাহন হিসেবে উট ছিল না আর সেই যুদ্ধের সময় বাহন হিসেবে দু'টি উট একত্রিত করে নিয়েছিলাম। এছাড়া মহানবী (সা.) যে যুদ্ধাভিযানেই বের হতে মনস্থ করতেন, সেটি তিনি গোপন রেখে অন্য কোন দিকে যাচ্ছেন –এমনটি প্রকাশ করতেন। তখনকার দিনে সাধারনত এমনটিই হতো অর্থাৎ এটিই ছিল যুদ্ধের কৌশল। তাই মহানবী (সা.) প্রথমত তা গোপন রাখতেন আর দ্বিতীয়ত দীর্ঘ পথ সফর করতেন এবং পথ পরিবর্তন করে নিতেন। মোটকথা তিনি বলেন যে, যখন সেই যুদ্ধাভিযান শুরু হয়, তখন মহানবী (সা.) সেই যুদ্ধাভিযানে প্রখর গরমের সময় বের হন অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধাভিযানে। আর তাঁর সামনে দীর্ঘ সফর এবং অনাবাদি বন-জঙ্গল আর শত্রুপক্ষ তো ছিলই যারা সংখ্যায় ছিল অগণিত।

তিনি (সা.) মুসলমানদেরকে তাদের (তথা শত্রুপক্ষের) অবস্থা পরিষ্কারভাবে বলে দেন যেন তারা নিজেরা আক্রমণের জন্য যতটা প্রস্তুতি গ্রহণের আবশ্যকতা আছে, ততটা প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। সেই যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.) কোন বিষয় গোপন রাখেন নি বরং বলে দিয়েছিলেন যে, আমরা অমুক জায়গায় যাব আর সেখানে অমুক শত্রু আছে, তাই ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে নাও। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) তাদেরকে সেই দিক সম্বন্ধেও অবগত করে দেন, যেদিকে তিনি (সা.) যেতে চাচ্ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর সাথে যথেষ্ট সংখ্যায় মুসলমান ছিল। হযরত কা'ব বলেন, কোন এক ব্যক্তিও এমন ছিল না যে অনুপস্থিত থাকতে চাচ্ছিল কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন যে, তার অনুপস্থিত থাকার বিষয়টি মহানবী (সা.) টের পাবেন না যতক্ষন না তার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয়। মহানবী (সা.) সেই যুদ্ধাভিযান ঐ মুহূর্তে পরিচালনা করেছিলেন যখন ফল পেকে গিয়েছিল আর ছায়াও ভালো লাগতো অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল ছিল। মহানবী (সা.) সফরের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন আর মহানবী (সা.)-এর সাথে মুসলমানরাও। তিনি (রা.) বলেন, আমি সকালে এই উদ্দেশ্যে যেতাম যে, আমিও তাদের সাথে যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত করব, সফরের প্রস্তুতি নিব, কিন্তু আমি ফেরত আসতাম আর কোন কিছুই করতাম না। সদিচ্ছা নিয়ে বের হতাম কিন্তু সন্ধ্যায় ফেরত চলে আসতাম আর প্রস্তুতি নেওয়া হতো না। আমি মনে মনে ভাবতাম, আমি প্রস্তুতি নিতে পারি, আমার কাছে সরঞ্জামও আছে। মোটকথা তিনি বলেন যে, আমি দিবা-নিশি এই চিন্তায় মগ্ন থাকলাম, অন্যদিকে লোকেরা প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নেয় আর এক সকালে মহানবী (সা.) যাত্রা করেন আর মুসলমানরাও তাঁর সাথে যাত্রা করে, কিন্তু আমি কোনরূপ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করি নি। আমি ভাবলাম, মহানবী (সা.) যাত্রা করলে এর এক বা দুই দিন পরে প্রস্তুতি নিব এবং তাঁদের সাথে গিয়ে শামিল হব কেননা সফরের বাহন তো আমার কাছে আছেই আর আমি এ কাজ সহজেই করতে পারতাম। মোটকথা তিনি বলেন, তাদের চলে যাওয়ার পরবর্তী দিন সকালে মনে হলো প্রস্তুতি নিই কিন্তু পুনরায় কিছুই না করে ফেরত চলে আসি। পরের দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিন আমি আবার যাই এবং ফিরে আসি কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। এ অবস্থাই চলতে থাকে আর এভাবে সেনাবাহিনী দ্রুতগতিতে অনেক দূরে চলে যায়। আমিও চিন্তা করতে থাকি যে, যাত্রা শুরু করব এবং তাদের সাথে মিলিত হব। হায়! যদি আমি এমনটি করতাম। কিন্তু আমি এমনটি করতে সমর্থ হই নি। আমি এমনটি করতে পারি নি। মহানবী (সা.)-এর চলে যাওয়ার পর যখনই আমি মানুষের কাছে যেতাম এবং তাদের মাঝে ঘুরাফেরা করতাম তখন এবিষয়টি আমাকে ব্যথিত করে তুলত। কেননা আমি তখন এমন মানুষদেরই দেখতাম যাদেরকে কপটতার কারণে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা হতো। তিনি বলেন, মদিনার গলিতে বের হলেই সেসব লোকের সাথেদেখা হতো যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল এবং যাদের সম্পর্কে সাধারণত এ ধারণা ছিল যে, তাদের মাঝে কপটতা পাওয়া যায় বা তারা দুর্বল মানুষ যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা অপারগ আখ্যায়িত করেছেন অথবা অপারগ ছিল কিংবা যারা ভীতু এবং যাদের হৃদয়ে কপটতা ছিল। যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তাবুকে পৌঁছার পূর্বে আমাকে স্মরণ করেন নি এবং আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসও করেন নি। কিন্তু তাবুকের প্রান্তরে লোকদের মাঝে বসে থাকা অবস্থায় তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কা'ব কোথায়? তখন বনু সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তার দুটি চাদর এবং তার ডানে বামে তাকানো তাকে বিরত রেখেছে। অর্থাৎ হয়ত কোন কাজের সম্মুখীন হয়েছে নয়তো তার মাঝে কোন ধরনের অহমিকা সৃষ্টি হয়েছে যার জন্য সে আসতে পারে নি। হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.) এটি শুনে বলেন, তুমি কতইনা মন্দ কথা বলেছ, না, বিষয়টি এমন নয়। তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তার সম্পর্কে আমাদের যে অভিজ্ঞতা তা তো ভালোই। কা'ব সম্পর্কে এখন পর্যন্ত আমারে যে অভিজ্ঞতা তা ভালো, তার মাঝে কোন প্রকার অহমিকা, আত্মম্ভরিতা বা কপটতা নেই। একথা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা.) নীরব হয়ে যান।

হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.) বলেন, আমি যখন জানতে পারি মহানবী (সা.) ফিরে আসছেন অর্থাৎ যে অভিযানে গিয়েছিলেন সেখান থেকে ফিরে আসছেন, তখন আমি চিন্তিত হই এবং বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত খুঁজতে থাকি যে, আগামীকাল আমি কোন্ কথা বলে মহানবী (সা.)-এর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাব। কোন্ অজুহাত দাঁড় করাব। নিজের পরিবারের মতামত দেয়ার মতো সকল সদস্যের সাথে পরামর্শ করি। মানুষকেও জিজ্ঞেস করি যে, কী অজুহাত দাঁড় করানো যায়? কিন্তু যখন বলা হলো,মহানবী (সা.) পৌঁছে গেছেন তখন আমার মন থেকে সকল মিথ্যা ভাবনা দূর হয়ে যায়। যত অজুহাত ছিল তা দূর হয়ে যায় এবং আমি বুঝতে পারি, আমি কোন মিথ্যা বলেই মহানবী (সা.)-এর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পাব না। এজন্য আমি সবকিছু সত্য সত্য বলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। মহানবী (সা.) যখন কোন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন তিনি প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নফল নামায পড়তেন তারপর মানুষের সাথে সাক্ষাতের জন্য বসে যেতেন। তিনি (সা.) যখন এমনটি করলেন তখন পিছনে থাকা অর্থাৎ যারা সফরে যায় নি সেই সব লোক মহানবী (সা.)-এর কাছে যায় এবং তাঁর সমীপে অপারগতার কথা বলতে থাকে, সবাই বিভিন্ন ধরনের অজুহাত দাঁড় করাতে থাকে যে, তার না যাওয়ার কী কারণ ছিল আর কসম খেতে থাকে। এমন লোকের সংখ্যা ৮০জনের অধিক হবে যারা এধরনের কসম খেয়ে মিথ্যা বলে অজুহাত দাঁড় করাচ্ছিল এবং নিজেদের অপারগতার কথা প্রকাশ করছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের বাহ্যিক অজুহাত মেনে নেন, তাদের বয়আত নেন, তাদের জন্য ইস্তেগফার করেন এবং তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদি আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দেন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে! তোমরা যেহেতু বাহ্যত এ কথা বলছো তাই আমি মেনে নিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের ক্ষমার উপকরণ সৃষ্টি করুন। বাকি এ বিষয়টি আমি আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। তিনি (রা.) আরো বলেন, মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে আমি যখন তাঁকে সালাম করি তখন তিনি (সা.) অসন্তুষ্ট মানুষের ন্যায় হেসে আমার দিকে তাকান। তিনি (সা.) হাসেন, কিন্তু এমনভাবে দেখেন যেন কোন অসন্তোষ রয়েছে। এরপর তিনি (সা.) বলেন, এগিয়ে আস। আমি এগিয়ে আসি এবং তাঁর সামনে বসে পড়ি। মহানবী (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, কিসের জন্য তুমি পিছনে ছিলে, আমাদের সাথে কেন সফর কর নি?তুমি কি বাহন ক্রয় কর নি? আমি বললাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কসম! আমি এমনটি করেছি আর আপনি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কারো সামনে যদি আমি বসে থাকতাম তাহলে আমি অবশ্যই তার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে কোন না কোন অজুহাত উপস্থাপন করতাম, কেননা আমাকে অনন্য বাগ্মিতার গুণ দান করা হয়েছে এবং আমি খুব ভালো অজুহাত দাঁড় করাতে পারি। আমি বেঁচে যেতে পারতাম, কিন্তু খোদার কসম! আমি জানতামযে, আজকে আপনার নিকট কোন মিথ্যা বলে আপনাকে সন্তুষ্ট করলেও অচিরেই আল্লাহ্ তা'লা আমার প্রতি আপনার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। আমি আমার বাকপটুতার মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে ঠিকই বাঁচতে পারতাম কিন্তু পরক্ষণে আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধভাজন হতাম যা (আল্লাহ্ তা'লার মাধ্যমে) আপনিও জেনে যেতেন। তিনি আরো বলেন, আমার সত্য কথা বলাতে আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্টও হন তবুও আমি আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমা লাভের আশা রাখি। আপনি হয়ত সত্য কথা বলাতে অসন্তুষ্ট হবেন কিন্তু আমি আশা করি, খোদা তা'লা আমার সাথে ক্ষমার আচরণ করবেন। এরপর হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.) বলেন, না, খোদার কসম! আমার না যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। আমার এমন কোন অজুহাত নেই যা আপনাকে বলবো। আল্লাহ্‌র কসম! আপনার কাফেলা থেকে যখন আমি পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম তখনকার মতো সুস্বাস্থের অধিকারী এবং স্বচ্ছল অবস্থায় আমি ইতিপূর্বে কখনো ছিলাম না। মহানবী (সা.) একথা শুনে বলেন, সে সত্য কথা বলেছে। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, উঠ এবং তোমার ব্যাপারে খোদা তা'লার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর। আমার সামনে থেকে এখন চলে যাও। আমি উঠে চলে

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা কুরআন শরীপকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে সহিত গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ৪৫)

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দায়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

আসলাম এবং আমার পিছনে পিছনে বনু সালামার কিছু লোকও উঠে আসে। তারা আমাকে বলে, খোদার কসম! আমরা জানি না তুমি ইতিপূর্বে কোন অপরাধ করেছ কি-না। মহানবী (সা.)-এর সম্মুখে তুমি কোন অজুহাত কেন উপস্থাপন কর নি, যেখানে তোমার চেয়েও পিছনে পড়ে যাওয়া লোকেরা কত বাহানা উপস্থাপন করছিল। আমি পূর্বেই বলেছি, এরকম আশি জন লোক ছিল। তোমার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এস্তেগফার করাটাই তোমার এই পাপ ক্ষমা করানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। কা'ব বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! এই লোকগুলো আমাকে এতটাই ভর্ৎসনা করতে থাকে যে, আমিও মনস্থ করে বসি যে, ফিরে যাব এবং নিজের কথা মিথ্যা সাব্যস্ত করব; (অর্থাৎ পুনরায় মহানবী (সা.)-এর সমীপে ফিরে যাব এবং নিবেদন করব যে 'আমি পূ র্বে যা বলেছিলাম তা ভুল ছিল এবং কোন না কোন অজুহাত প্রদর্শন করব।) তিনি বলেন, কিন্তু তারপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম; (অর্থাৎ সেই লোকদেরকে যারা আমাকে বলছিল যে, তুমি সত্য কথা বলে ভুল করেছ, ফিরে যাও) যারা আমাকে উস্কাচ্ছিল বা ভুল কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল– তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মতো আরও কেউ কি আছে যে তাঁর (সা.) কাছে এমন স্বীকারোক্তি দিয়েছে? (যেমনটি আমি বলেছি, সেরকম সত্য বলেছে) তারা বলে, হ্যাঁ, আরও দু'জন ব্যক্তি রয়েছে; তারাও তা-ই বলেছে যা তুমি বলেছ, আর তারাও সেই উত্তরই পেয়েছে যা তোমাকে দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করি, তারা কারা? তারা বলে, একজন হলো মুরারা বিন রবী' আমরী, অপরজন হলো হেলাল বিন উমাইয়া ওয়াকফি। হযরত কা'ব বলেন, তারা আমার কাছে এমন দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তির উল্লেখ করল যারা বদরে অংশগ্রহণ করেছিলেন; তাদের উভয়ের মাঝে আমার জন্য আদর্শ ছিল। লোকেরা যখন আমার কাছে সেই দু'জনের উল্লেখ করল, তখন আমি তাদের কাছ থেকে চলে গেলাম; আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) মুসলমানদেরকে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দেন।

যখন বলা হলো– হ্যাঁ, আরও দুই ব্যক্তি রয়েছেন, তখন আমার মনে হলো– এরা দু'জন প্রকৃত পুণ্যবান মানুষ, বদরেও অংশগ্রহণ করেছেন, তাই আমি এখন তাদের দলেই থাকব, কোন মিথ্যা অজুহাত দেখাব না। তিনি বলেন, আমি চলে গেলাম, আর ইতোমধ্যে মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দেন, অর্থাৎ একপ্রকার সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে যায়। অর্থাৎ এই লোকেরা, যারা তাঁর (সা.) পিছনে রয়ে গিয়েছিল, লোকজন তাদেরকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে।মনে হচ্ছিল যেন তারা আমাদেরকে একেবারে চেনে-ই না।এ বিষয়ে যখন নিষেধ করে দেয়া হলো তখন মানুষজন আমাদের সামনে আসতো না। আমাদেরকে এমনভাবে এড়িয়ে চলতো যেন আমাদেরকে চিনে-ই না। এমনকি এই পৃথিবীও আমার কাছে অপরিচিত মনে হচ্ছিল। তা তেমন ছিল না যেমন আমি জানতাম। মদিনার অলি-গলি, এই শহর, এই পৃথিবী আমার জন্য সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়ে গিয়েছিল। এটি আমার কাছে সেই জিনিস মনে হচ্ছিল না যাকে আমি পূর্বে চিনতাম। মনে হচ্ছিল আমি এক নতুন জায়গায় এসে পড়েছি, কেননা লোকজন আমাকে এড়িয়ে চলছিল। যাহোক তিনি বলেন, এ অবস্থায় পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করি এবং আমার অপর দুইজন সাথী হযরত হেলাল বিন উমাইয়া এবং মুরারা বিন রবী' অত্যন্ত লজ্জা বোধ করছিল। তাদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তারা নিজেদের ঘরে বসে কাঁদতো, তারা নিজেদের ঘর থেকে বের হতো না, অর্থাৎ হেলাল প্রমুখগণ। হযরত হেলাল ঘরে-ই থাকতেন, তিনি দীর্ঘকাল ঘরে অবস্থান করেন এবং কাঁদতে থাকেন। আর বলেন, আমি অর্থাৎ, হযরত কা'ব বলেন, আমি তাদের মধ্যে অধিক যুবক ছিলাম এবং তাদের তুলনায় অধিক কষ্ট সহিষ্ণু ছিলাম। আমি বাইরেও বের হতাম। আমি তাদের ন্যায় ঘরে কসে কাঁদতে থাকি নি এবং এস্তেগফার করি নি; আমি এস্তেগফার করতাম কিন্তু একইসাথে বাইরেও বের হতাম এবং মুসলমানদের সাথে নামাযে শরীক হতাম। মসজিদেও যেতাম, বাজারেও ঘুরে-বেড়াতাম, কিন্তু ে কউ আমার সাথে কথা বলত না। আর রসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছেও যেতাম। মসজিদে মজলিস বসতো, সেখানেও যেতাম। যখন তিনি (সা.) নামায শেষে তাঁর (সা.) জায়গায় এসে বসতেন তখন তাঁকে (সা.) সালাম দিতাম আর মনে মনে ভাবতাম যে, তিনি (সা.) আমার সালামের জবাবে ঠোঁট নেড়েছেন কিনা। আর আমি তাঁর (সা.) নিকটবর্তী হয়ে নামায আদায় করতাম এবং আড় চোখে তাঁকে (সা.) কে দেখতাম। আর আমি যখন নামাযে মগ্ন হতাম তখন তিনি (সা.) আমাকে দেখতেন। কিন্তু আমি যখন তাঁর (সা.) এর দিকে তাকাতাম তখন তিনি (সা.) আমার ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। যখন মানুষের এই কঠোরতা আমার জন্য দীর্ঘায়িত হলো, আমি হযরত আবু কাতাদাহ (রা.) এর বাগানের দেওয়াল লাফিয়ে পার হই। তিনি আমার চাচাতো ভাই ছিলেন এবং মানুষের মধ্য থেকে আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি তাকে আসসালামু আলাইকুম বললাম, কিন্তু খোদার কসম! তিনি আমার সালামের উত্তর পর্যন্ত দিলেন না। আমি বললাম, আবু কাতাদাহ! আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি তুমি কি জানো, আমি আল্লাহ্ এবং রসূল (সা.)-কে ভালবাসি? তিনি নিরব রইলেন। আমি পুনরায় তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম; তিনি নিরব রইলেন। আমি তৃতীয়বার তাকে জিজ্ঞেস করলাম এবং কসম দিলাম কিন্তু তিনি বললেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন যে, ভালোবাস কি না। এ কথা শুনে আমার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। আমি দেওয়াল টপকে সেখান থেকে চলে আসি। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, এরই মধ্যে আমি মদিনার বাজারে যাচ্ছিলাম, তখন দেখতে পেলাম সিরিয়ার অধিবাসী নাবতিদের মধ্য থেকে একজন 'নাবতী', যে মদিনায় শস্য বিক্রি করতে এসেছিল; সে বলছিল, কা'বের খোঁজ কে দিতে পারে? এটা শুনে মানুষতাকে ইশারা করতে লাগল। সে আমার কাছে এসে গাসসানের বাদশাহ্‌র একটি পত্র আমাকে দেয়। এর বিষয়বস্তু ছিল, আম্মা বা'দ; আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমার সঙ্গী তোমার সাথে কঠোর ব্যবহার করছে এবং তোমাকে নিঃসঙ্গ ছেড়ে দিয়েছে। অথচ আল্লাহ্ তোমাকে এমন ঘরে জন্ম দেন নি যেখানে তুমি লাঞ্ছিত হবে এবং তোমাকে ধ্বংস করা হবে। তুমি আমাদের সাথে মিলিত হও, আমরা তোমাকে সম্মান প্রদর্শন করব। আমি এই পত্র পাঠ করে বলি, এটিও একটি পরীক্ষা। আমি পত্রটি নিয়ে আগুনের দিকে গেলাম এবং সেটিকে তার মাঝে নিক্ষেপ করি।

পঞ্চাশ রাতের মধ্যে যখন চল্লিশ রাত অতিবাহিত হয় তখন আমি দেখতে পাই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সংবাদ বাহক আমার নিকট আসছে। সে বললো, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তুমি নিজের স্ত্রী থেকে পৃথক হয়ে যাও। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি তাকে তালাক দিয়ে দিব নাকি অন্য কিছু করব। তিনি বলেন, তার কাছ থেকে পৃথক থাক এবং তার নিকটে যেও না। তিনি (সা.) আমার দুই সাথীকেও, অর্থাৎ হযরত হেলালকেও অনুরূপ নির্দেশ প্রেরণ করেন। তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে বলি যে, তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও এবং ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানে থাক যতক্ষন না আল্লাহ্ তা'লা এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। হযরত কা'ব বলতেন, এরপর হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রী রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! হেলাল বিন উমাইয়া খুবই বৃদ্ধ, তার কোন সেবকও নেই। আমি যদি তার সেবা করি তবে কি আপনি অপছন্দ করবেন? তিনি (সা.) বলেন, না, ঠিক আছে সেবা করতে থাক, খাবার রান্না ও ঘরের অন্যান্য কাজ করতে থাক, কিন্তু সে যেন তোমার নিকটে না আসে। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! তার তো কোন বিষয়ে খেয়ালই নেই। আল্লাহ্‌র কসম! সে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত শুধু কেঁদেই যাচ্ছে। সে আর কি বলবে, যখন থেকে সে শাস্তি পেয়েছে, বয়কট হয়েছে, সে তো বসে বসে শুধু কাঁদছে, অর্থাৎ যখন থেকে তার ব্যাপারে উক্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে। হযরত কা'ব বলেন, আমার কিছু আত্মীয় স্বজন আমাকে বলেছে, তুমিও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে গিয়ে নিজ স্ত্রীর ব্যাপারে অনুরুপ অনুমতি নিয়ে নাও যেরুপ হযরত হেলাল বিন উমাইয়ার স্ত্রীকে তার সেবা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সে যেহেতু অনুমতি পেয়েছে, তুমিও পাবে। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে কখনো এরূপ অনুমতি নিব না। না জানি রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে এ সম্পর্কে কি জবাব দিবেন। আমি তো যুবক মানুষ আর হযরত হেলাল তো বৃদ্ধ। তিনি বলেন, এরপর আমি আরো দশ রাত অপেক্ষায় থাকলাম। এমনকি ঐ সময় থেকে পঞ্চাশ রাত পূর্ণ হলো যখন থেকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছিলেন।

যুগ খলীফার বাণী

আমরা আহমদীদেরকেই জগতকে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করতে হবে, এর জন্য আবশ্যক হল খোদার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করা। *(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)*

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family Bolpur, (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Kibria, Santoshpur (Murshidabad)

পঞ্চাশতম রাত শেষে সকালে ফজরের নামায আদায় করে যখন আমি আমার ঘরের একটি কক্ষের ছাদের ওপরসেই অবস্থায় বসে ছিলাম, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছিলেন যে, আমার জীবন আমার কাছে সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল আর পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে তা আমার জন্য সঙ্কীর্ণ মনে হচ্ছিল, এমন পরিস্থিতিতে আমি উচ্চকণ্ঠে একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনতে পাই, যা মদিনার উত্তর দিকের প্রসিদ্ধ সালা পাহাড় থেকে আসছিল এবং উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলা হচ্ছিল যে, হে কা'ব বিন মালেক! তোমার জন্য সুসংবাদ। তিনি বলেন, এটি শুনামাত্রই আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়ি আর বুঝে নিই যে, আমার সমস্যা দূর হয়ে গেছে, আর আমাকে যে ডাকছে সে সুসংবাদও দিচ্ছে, অতএব তা সত্যিই আমার মুক্তির কারণ এবং সমস্যা দূরীভূত হওয়ার কারণ। মহানবী (সা.) ফযরের নামায আদায়ের পর ঘোষণা প্রদান করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটি শুনে লোকজন আমাদেরকে এইশুভসংবাদ দিতে থাকে আর আমার উভয় সাথিও আমাকে সুসংবাদ দেয়। অর্থাৎ হযরত হেলাল (রা.) এবং অন্যজন। আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি আমার কাছে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত বেগে আসেন আর পাহাড়ের চূড়ায় উঠেন আর তার আওয়াজ ঘোড়ার চেয়ে দ্রুতগতিতে আমার কানে পৌঁছে, তিনি যখন আমার কাছে সুসংবাদ দিতে আসেন অর্থাৎ যার আহ্বান আমি পূর্বেই শুনেছিলাম, তখন আমি আমার দু'টি কাপড় যা সেসময় আমার পরনে ছিল তা খুলে আমি তাকে পরিয়ে দেই, আমি তা এজন্য করি যে, তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌র কসম! সেসময় সেটি ছাড়া আমার কাছে দেয়ার মতো আর কিছুই ছিল না, অর্থাৎ সেই দু'টি কাপড়ই ছিল, তাই আমি আরো দু'টি বস্ত্র অন্য কারো কাছ থেকে ধার নিয়ে সেগুলো পরিধান করে মহানবী (সা.)-এর কাছে চলে যাই আর লোকেরা আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য দলে দলে আসতে থাকে আর তওবা কবুলের জন্য আমাকে মোবারকবাদ দিতে থাকে। মানুষ বলতো, তুমি ধন্য। আল্লাহ্ তা'লা তোমার প্রতি করুণা করে তওবা কবুল করেছেন। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আমি মসজিদে পৌঁছলাম। গিয়ে দেখিমহানবী (সা.) বসে আছেন। তাঁর (সা.) চারপাশে লোকজন রয়েছে। হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ আমাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসেন; আমার সাথে করমর্দন করেন এবং আমাকে অভিনন্দন জানান। মুহাজেরীনদের মধ্য থেকে তিনি ছাড়া অন্য কেউ উঠে এসে আমার কাছে আসেন নি আর তালহার এই কথা আমি কখনো ভুলবো না। হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আমি যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আসসালামু আলাইকুম বলি তখন মহানবী (সা.) সালামের উত্তর দেন আর আনন্দে তাঁর মুখখানা উজ্জ্বল ছিল। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, তোমার জন্য শুভসংবাদ। তোমার মা তোমাকে জন্মদানের পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন শুভ দিন কখনো তোমার জীবনে আসে নি। খুব ভালো দিন তুমি অতিবাহিত করেছ। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই সুসংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে? তিনি (সা.) বলেন, না, বরং খোদাতা'লার পক্ষ থেকে। মহানবী (সা.) যখন আনন্দিত হতেন তখন তাঁর (সা.) পবিত্র চেহারা এমন আলোকিত হয়ে যেত যেন তা চাঁদের একটি টুকরো। আর আমরা সেই ঔজ্জ্বল্য দেখেই তাঁর (সা.)-এর আনন্দ আঁচ করে ফেলতাম। তিনি বর্ণনা করেন, আমি যখন মহানবী (সা.)-এর সামনে বসি তখন আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই তওবা গৃহিত হওয়ার কারণে ধনসম্পদ থেকে আমি আমার নিজের দাবি প্রত্যাহার করলাম যা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্এবং তাঁর রসূলের জন্য সদকাস্বরূপ হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, ধনসম্পদ থেকে নিজের জন্যও কিছু রাখ কেননা এটাই তোমার জন্য উত্তম। আমি বললাম, আমি খায়বারের প্রান্তরে আমার অংশটুকু রেখেছি। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সত্যের কারণে মুক্তি দিয়েছেন আর আমার তওবার মধ্যে একথাও ছিল যে, আমি আমৃত্যু সর্বদা সত্য বলব, কারণ খোদার কসম! মুসলমানদের মধ্যে আমি এমন কাউকে জানি না যাকে আল্লাহ্ তা'লা তার সত্য বলার কারণে এত সুন্দরভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন যেভাবে আমার পরীক্ষা নিয়েছেন। আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করলাম যে, সেই সময় থেকেআজ পর্যন্ত আমি জেনে বুঝে কখনো ভ্রান্ত কথা বলিনি এবং আমি আশা করি আল্লাহ্তা'লা ভবিষ্যতেও আমার দ্বারা, তিনি বলেন, যতদিন জীবিত আছি আমাকে মিথ্যা থেকে আমাকে সুরক্ষিত রাখবেন।

পুনরায় বলেন, আল্লাহ্ তাঁর রসূল (সা.) এর ওপর এই ওহী অবতীর্ণ করেন এবং তিনি স্বীয় নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি তওবা গ্রহণ করে রহমতের দৃষ্টি প্রদান করেছেন, যারা কষ্টের সময় তাঁর অনুসরণ করেছিল, সেই ঘটনার পর যখন এক দলের হৃদয় বক্র হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। এরপরও তিনি তাদের তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় তিনি তাদের জন্য মহা কৃপালু ও বার বার দয়াকারী।

যাহোক, তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! এর পর আল্লাহ্ আমাকে ইসলামের হেদায়াত দিয়েছেন। আমার মতে তিনি কখনো এর চেয়ে বড় কোন পুরস্কার দেননি যে, আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে সত্য বলেছি। তিনি বলেন, কৃতজ্ঞতা যে, আমি তাঁর (সা.) কাছে মিথ্যা বলিনি। নতুবা আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম যেরূপ তারা ধ্বংস হয়ে গেছে যারা মিথ্যা বলেছিল। এরপর বলেন, আর আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাবাদিদের সম্পর্কে অত্যন্ত ঘৃণ্য ভাষা ব্যবহার করেছেন যা তিনি অন্য কারো জন্য ব্যবহার করেননি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যখন তুমি তাদের দিকে যাবে, তখন তারা তোমার সামনে আল্লাহ্‌র কসম খাবে। আল্লাহ্ সেই সমস্ত অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর প্রতি কখনো খুশি হবেন না। হযরত কা'ব বলেন, আমাদের তিনজনের সিদ্ধান্ত সেসব লোকের সিদ্ধান্তের আরো পরে রাখা হয়। অর্থাৎ যাদের ওযর রসূলুল্লাহ্ (সা.) কবুল করেছিলেন যখন তারা তাঁর সামনে কসম খেল এবং তিনি তাদের বয়আত নিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমার দোয়া করলেন। আর রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সিদ্ধান্তকে মুলতবী রাখেন, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আল্লাহ্ এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। আর এটিই সেই বিষয় যে ব্যপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا (সূরা তওবা, আয়াত: ১১৮)

তিনি বলেন, এটি যুদ্ধ থেকে আমাদের পশ্চাতে থেকে যাওয়া নয়, এর অর্থ এটি নয় যে, এই তিনজন যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল। এটি যুদ্ধে আমাদের পশ্চাতে থাকা ছিল না বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে আমাদেরকে সেসব লোক থেকে পশ্চাতে রেখে দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ হলো যারা মহানবী (সা.)-এর নিকট কসম খেয়েছিল অর্থাৎ সেই শপথকারীদের এবং মিথ্যাবাদীদের থেকে আমরা আলাদা ছিলাম। এটি হলো এর অর্থ। এটি নয় যে, তারা যুদ্ধ থেকে পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল। যাহোক তিনি বলেন, এটি যুদ্ধ থেকে আমাদের পশ্চাতে অবস্থান করা ছিল না বরং আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদেরকে সেসব লোক থেকে পশ্চাতে রাখার অর্থ হলো, যারা মহানবী (সা.)-এর নিকট শপথ করেছিল এবং তাঁর (সা.) কাছে অজুহাত উপস্থাপন করেছিল এবং তিনি (সা.) তাদের অজুহাত গ্রহণ করেছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪৪১৮)

হযরত হেলাল বিন উমাইয়া আমীর মুআবিয়ার শাসনামলে মৃত্যু বরণ করেন। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪২৮)

তাবুকের যুদ্ধ সম্পর্কে আরো একটি সংক্ষিপ্ত নোট রয়েছে সেটিও পাঠ করছি। পূর্বেও একবার বিস্তারিত বলেছি, আরেকবার সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করছি। তাবুক মদিনা থেকে সিরিয়ার সেই রাজপথের উপর অবস্থিত যা বানিজ্য কাফেলাগুলোর যাতায়াতের পথ ছিল। আর এটি কুরা উপত্যকা এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি শহর। এটিকে আসহাবুল আইকার শহরও বলা হয়েছে। যাদের প্রতি হযরত শোয়াইব (আ.) আবির্ভূত হয়েছিলেন। হযরত শোয়াইব (আ.) মাদইয়ানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি (আ.) মাদইয়ানের পাশাপাশি আসহাবুল আইকা-র প্রতিও আবির্ভূত হয়েছিলেন। মদিনা থেকে এর দূরত্ব প্রায় পৌনে চারশ মাইল। এই যুদ্ধের নাম তাবুক-এর যুদ্ধ ছাড়া আরও কিছু নাম আছে। একে গাযওয়াতুল উসরাহ্ বা জাইশুল উসরাহ্ও বলা হয় অর্থাৎ কষ্টের যুদ্ধ বা কষ্টের সৈন্যবাহীনি। গাযওয়াতুল ফাযেহাও বলা হয় অর্থাৎ সেই যুদ্ধ যা মুনাফিকদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছে।

মহানবী (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সর্বপ্রথম তবলীগি পত্র লিখেছিলেন রোমের সম্রাট কায়সারকে এবং পত্রটি লিখে তৎকালীন বসরার খ্রিষ্টান গভর্নর হারেস বিন আবু শিমার গাস্‌সানির নিকট প্রেরণ করেন। সুতরাং যখন তার নিকট মহানবী (সা.)-এর বার্তা পৌঁছলো তখন সে শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ করে এবং মদিনার উপর আক্রমণ করার হুমকি দিল। যার ফলে মদিনারলোকজনের মধ্যে কিছুদিন পর্যন্ত এই আশঙ্কা ছিল যে, সে যে কোন সময় মদিনাতে আক্রমণ করবে।

(সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত ' সীরাত খাতামান্নাবীইন, পৃ: ৮০২) (সহী বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, হাদীস-৪৯১৩)

এই যুদ্ধের প্রস্তুতিস্বরুপ এটি হলো যে, সিরিয়ার নিব্‌তি গোত্রের লোকেরা, যারা তেলের ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদিনাতে সফরে আসতো তাদের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর নিকট এই সংবাদ আসে যে, রোমের কায়সার-এরএকটি সৈন্যদল কায়সারের সাথে সিরিয়াতে একত্রিত হয়েছে এবং অপর একটি বর্ণনা অনুসারে আরবের খ্রিষ্টানরা কায়সারের নিকট লিখেছিল যে, এই ব্যক্তি, যে নবুয়তের দাবিদার, সে ধ্বংস হয়ে গেছে (নাঊযুবিল্লাহ্) এবং মুসলমানদের উপর ক্ষরা এসেছে যার কারণে তাদের গবাদি পশু ইত্যাদি ধ্বংস হয়ে গেছে। এতে কায়সার একজন বড় সেনাপতির নেতৃত্বে অনেকগুলো গোত্রের যোদ্ধাদের

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 16 Jan , 2020 Issue No.3

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সমন্বয়ে চল্লিশ হাজার সৈনিকের একটি সেনাবাহিনী গঠন করে যা সিরিয়ার একটি শহর বাল্কা-তে একত্রিত হয়। যাহোক এই সংবাদে তেমন কোন সত্যতা ছিল না কিন্তু এই সংবাদটি যুদ্ধপ্রস্তুতির একটি কারণ হয়ে গেল। মহানবী (সা.)-এর নিকট যখন এই সংবাদ আসে, সে সময় মানুষের মধ্যে শক্তি ছিল না তারপরেও তিনি (সা.) লোকদের মাঝে যুদ্ধযাত্রার ঘোষণা করালেন এবং যেদিকে সফর করতে হবে তাদেরকে সেই স্থান সম্পর্কে অবগত করলেন, যেন তারা এর জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। এটি 'শারাহ্ আল্লামা যুরকানি'-তে লেখা আছে।

('শারাহ্ আল্লামা যুরকানি', ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৭-৬৮) (লুগাতুল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭৪)

এতে সাহাবাদের আত্মত্যাগ এবং মুনাফেকদের ষড়যন্ত্রও প্রকাশিত হয়েছে। নবী করীম (সা.) এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ঘোষণা করা মাত্রই মদিনাতে একটি তাড়াহুড়া পড়ে যায়। যে সকল সাহাবী সামর্থ্য রাখতেন তারা তাদের সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত কুরবানী পেশ করতে লাগলেন, যারা অপারগ ছিলেন তাদের আবেগ ও উচ্ছাস এতটা বেশি ছিল যে, তারা পায়ে হেঁটে যেতেও প্রস্তুত ছিল। এই অভিযানে সম্পদ প্রদানের জন্য কেউ বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটছিল আবার কেউ নিজের সামগ্রী একত্রিত করছিল আর নিজ মনিবের চরণে বেশি বেশি দান করার জন্য চেষ্টা করছিল। যাহোক, কেউ কিছু পাওয়া যায় কি-না সে জন্য নিজের বাড়িতে তন্নতন্ন করে খুঁজছিল যাতে সে-ও এর মাধ্যমে অভিযানে অংশ নিতে পারে। আর পদব্রজে যাওয়ার জন্যও মানুষ প্রস্তুত ছিল বরং অনেকের কাছে তো জুতা পর্যন্ত ছিল না, এমন লোকেরা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন এবং বলেন, আমাদের পা একেবারে খালি, আমরা যদি পায়ে হেঁটে যাওয়ার জন্য শুধুমাত্র জুতাও পাই তাহলে আমরা পদব্রজে যেতেও প্রস্তুত আছি, নতুবা আমাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে ফলে আমরা (যুদ্ধক্ষেত্রে) পৌঁছতে পারবো না। আর সে সময় এমন অবস্থা ছিল যে, তাদেরকে জুতা সরবরাহ করাও সম্ভব ছিল না। যাহোক, প্রত্যেকে স্ব-স্ব স্থানে নিজের প্রাণের নযরানা পেশ করার বা প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর ধারণা ছিল, তার বাড়িতে অনেক সম্পদ রয়েছে, সুতরাং তিনি চিন্তা ক রেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার আজ সুযোগ আছে তাই তিনি তার অর্ধেক সম্পদ এনে মহানবী (সা.)-এর সমীপে রেখে দেন। মহানবী (সা.) বলেন, বাড়ির লোকদের জন্য কি রেখে এসেছ? হযরত উমর (রা.) বলেন, অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এসেছি আর বাকি অর্ধেক রেখে এসেছি। হযরত আবু বকর (রা.) তার পুরো সম্পদ মহানবী (সা.)-এর সমীপে পেশ করেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, নিজের পরিবারের লোকদের জন্য কি রেখে এসেছ? তিনি উত্তরে বলেন, বাড়ির লোকদের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র প্রতি ঈর্ষা করে বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি হযরত আবু বকর (রা.)'র চেয়ে কোন ক্ষেত্রে কখনো অগ্রগামী হতে পারি না।

(সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৭৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, একদা আমাদের রসূল (সা.) অর্থের প্রয়োজনের কথা বলেন। তখন হযরত আবু বকর (রা.) ঘরের পুরো সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আবু বকর! বাড়িতে কি রেখে এসেছ? তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) তাঁর সম্পদের অর্ধেক নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, উমর! বাড়ীতে কি রেখে এসেছ? তিনি উত্তর দেন, অর্ধেক সম্পদ (রেখে এসেছি)। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, (তখন) মহানবী (সা.) বলেন, আবু বকর এবং উমরের কর্মকাণ্ডে যে পার্থক্য রয়েছে সেই একই পার্থক্য রয়েছে তাদের পদমর্যাদায়।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৫)

হযরত আবু বকর (রা.) তাবুকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-এর চরণে নিজের পুরো যে সম্পদ পেশ করেছিল তার মূল্যমান ছিল চার হাজার দেরহাম।

('শারাহ্ আল্লামা যুরকানি', ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৯)

তখন হযরত উসমান (রা.) অনেক উট ও ঘোড়া ছাড়াও নগদ অর্থ দান করেছিলেন। (তার) এই কুরবানীর কারণে মহানবী (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, এই দানের পর এখন উসমানের কোন কাজের জন্য তাকে আর জবাবদিহি করতে হবে না। এই সেবার পর এখন উসমানকে অন্য কোন আমলের বা কাজের জন্য আর জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে না। অপর একটি রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) বলেছেন, আজকের দিনের পর উসমান যে কাজই করুক না কেন তা তাকে কষ্ট দিবে না। একথা তিনি (সা.) দু'বার বলেন।

(সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭০০-৩৭০১)

('শারাহ্ আল্লামা যুরকানি', ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬৮-৬৯)

একজন সাহাবী ছিলেন হযরত আবু আকীল (রা.), তার কাছে যুদ্ধের জন্য দেওয়ার মতো কিছুই ছিল না। তিনি এই কৌশল আবিষ্কার করেন যে, কোন জায়গায় রাতে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ক্ষেতে পানি সিঞ্চনের চুক্তি করেন আর সারা রাত কূপ থেকে রশি দিয়ে টেনে পানি বের করেন আর ক্ষেতে সেচ দেন। এর বিনিময়ে তিনি দুই সা' বা চার-পাঁচ কিলোগ্রাম বা সের খেজুর পান যার অর্ধেক স্ত্রী -সন্তানের ভরণ পোষণের জন্য রাখেন আর অর্ধেক খোদা তা'লার পথে নিবেদনের জন্য মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ এ সময় তার অর্ধেক সম্পদ মহানবী (সা.)-এর চরণে উৎস্বর্গ করেন যার মূল্যমান ছিল চার হাজার চারশত দিরহাম। হযরত আসেম বিন আদী (রা.) একশত ওয়াসক খেজুর প্রদান করেন, এক ওয়াসক ষাট সা' আর এক সা' আড়াই কিলো বা সের এর সমান হয়ে থাকে। তখন মুনাফেকরা বলে যে, এটি লোকদেখানো ছাড়া আর কিছু নয়। তখন আল্লাহ্ তা'লা একটি আয়াতও নাযেল করেন। এ খেজুর, যা হযরত আসেম রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চরণে উৎস্বর্গ করেন-এটি প্রায় চৌদ্দ হাজার কিলো বা চৌদ্দ টন পরিমাণ হয়। মুনাফেকরা এটি দেখে বলে যে, এটি লোকদেখানো ছাড়া আর কিছু নয়। (এখানে এটি স্পষ্ট করতে চাই যে, গত খুতবায় আমি ভুলবশত হিসাব করতে গিয়ে ছয়শত কিলোগ্রাম বলেছিলাম, সেটি ছয়শত নয় বরং ছয় হাজার কিলোগ্রাম ছিল।) মুনাফেকরা যখন বলে যে, এটি লোকদেখানো কাজ, আল্লাহ্ তা'লা তখন এই আয়াত নাযেল করেন -

اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

(সূরা তওবা: ৭৯)

মু'মিনদের মধ্য থেকে যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পুণ্য কর্মে বা সদকার বিষয়ে অপবাদ আরোপ করে, তাদের ওপর অপবাদ আরোপ করে যারা পরিশ্রম

এর পর ৭ পাতায়

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir